শ্রীহরি

1513

মূল্যবান কাহিনী

मूल्यवान कहानियाँ (बँगला)

গীতাপ্রেস, গোরক্ষপুর

1513

।।শ্রীহরি।।

মূল্যবান কাহিনী

मूल्यवान कहानियाँ (बँगला)

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব
ত্বমেব সর্বং মম দেবদেব।।

গীতাপ্রেস, গোরক্ষপুর

Books are also available at—

1. **Gobind Bhavan**
   151, Mahatma Gandhi Road,
   Kolkata—700007
   Phone: 2268-6894 / 0251
2. **Howrah Station**
   (a) (P.F. No. 5) Near Tower Clock
   (b) (P.F. No. 18) New Complex
3. **Sealdah Station**
   (Near Main Enquiry)
4. **Kolkata Station**
   (P.F. No. 1, Near Over Bridge)
5. **Asansol Station**
   (P.F. No. 5, Near Over Bridge)
6. **Kharagpur Station**
   (P.F. No. 3)

Fourteenth Reprint 2015 5,000

Total 75,000

❖ **Price : ₹ 15**

(Fifteen Rupees only)

Printed & Published by :

Gita Press, Gorakhpur—273005 (INDIA)

(a unit of Gobind Bhavan-Karyalaya, Kolkata)

Phone - (0551) 2334721, 2331250; Fax - (0551) 2336997

web : **gitapress.org** e-mail : **booksales@gitapress.org**

Visit gitapressbookshop.in for online purchase of Gitapress publications.

॥ শ্রীহরিঃ ॥

অনুবাদকের নিবেদন

গোরক্ষপুরের গীতাপ্রেস দ্বারা প্রকাশিত **‘উপযোগী কহানিয়াঁ’** বইটি আকারে ছোট হলেও ওর মধ্যে যে গল্পগুলি সংকলিত হয়েছে সেগুলি পড়ে মনে হয়েছে গল্প তো নয় যেন এক একটি চুম্বক। একটি পড়তে আরম্ভ করলে পরেরটি, তার পরেরটি এই করে এক নিঃশ্বাসে সব কটি পড়ে ফেলার মতো। মূল বইটি হিন্দি ভাষায় রচিত। এতে ৩৬টি ছোট ছোট গল্পের যদিও অধিকাংশ বহুল প্রচলিত তবুও হিন্দিতে এগুলি এত সরল আর সুখপাঠ্য করে রচনা করা হয়েছে যে, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এগুলি পাঠ করে যারপরনাই আনন্দ পাবে। তাই গল্পগুলিকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের হাতে তুলে দেবার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না। গল্পগুলির বিশেষত্ব এই যে প্রত্যেকটি গল্প শিক্ষাপ্রদ এবং নীতিমূলক এবং প্রতিটি গল্পের বিশেষ প্রসঙ্গটি আকর্ষণীয় ছবির মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। ছোট বয়স থেকেই যদি ছেলেমেয়েদের মনে সহজজ্ঞান এবং চরিত্র গঠনের উপযোগী রসদ জুগিয়ে দেওয়া যায় তাহলে পরবর্তী জীবনে সেগুলিকেই সংশ্লেষন-বিশ্লেষন করে জীবনের পাথেয় হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব। এই আশা নিয়ে বইটির বাংলা অনুবাদ **‘মূল্যবান কাহিনী’** নাম দিয়ে প্রকাশ করা হল। আশা করি বইটি পড়ে পাঠকবর্গ উপকৃত হবেন।

—শম্ভুনাথ পাঠক

॥ শ্রীহরিঃ ॥

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১. সৎ লোক................	১
২. সজ্জন কাঠুরিয়া..........	৪
৩. লোভী রাজা	৮
৪. বিচার করে কাজ কোরো..................	১২
৫. দয়ার পুরস্কার............	১৪
৬. পিতা ও পুত্র.............	১৬
৭. ভগবান সর্বত্রই আছেন..	১৮
৮. বন্ধুর পরামর্শ............	২০
৯. স্বর্গ দর্শন................	২৩
১০. শ্রেষ্ঠ পুণ্যাত্মা.	২৮
১১. লোভের পরিণাম........	৩২
১২. একতাই বল.............	৩৪
১৩. ডাক্তার বিদায়	৩৬
১৪. দুই টাট্টু......	৩৮
১৫. ব্রহ্মার ঝুলি...	৪০
১৬. সর্বোত্তম জয়.	৪২
১৭. মূর্খরাজ......	৪৬
১৮. এস আর যাও.	৪৮
১৯. খরগোশ আর ব্যাঙ......	৫১
২০. বাদশাহ ও মালী.........	৫৪
২১. উপকারে বদলে প্রতি-উপকার.................	৫৬
২২. অতিথি সৎকার..........	৫৮
২৩. সারস আর কৃষক........	৬১
২৪. সারসের শিক্ষাদান.......	৬৩
২৫. উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা.	৬৬
২৬. ধূর্ত গাধা................	৬৮
২৭. লোভী বাঁদর............	৭০
২৮. লোভী কুকুর............	৭২
২৯. বাঁদরের বিচার..........	৭৩
৩০. শের চিতা লড়ে যায়, শিয়াল ভায়া হরিণ খায়...	৭৫
৩১. মিথ্যা কথার ফল.........	৭৭
৩২. অহংকারই পতনের কারণ.	৭৯
৩৩. ভুলের পরিণাম..........	৮২
৩৪. সত্যবাদী হরিণ..........	৮৪
৩৫. অপরকে ভরসা করতে নেই....................	৮৭
৩৬. মিথ্যা বড়াই-এর পরিণাম	৯০

॥ শ্রীহরিঃ ॥

সৎ লোক

এক দেশে এক ধনবান ব্যক্তি বাস করতেন। তিনি একটি দেব-মন্দির প্রতিষ্ঠা করে, দেবপূজার জন্যে একজন পূজারিকে নিযুক্ত করেছিলেন। মন্দিরের দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহের জন্যে অনেক জমি-জায়গা, চাষের খেত এবং ফল-ফুলের বাগান ইত্যাদি মন্দিরকে দান করে দিয়েছিলেন। তিনি এমন ব্যবস্থা করেছিলেন যাতে, মন্দিরে যে কোনো ক্ষুধার্ত ব্যক্তি, দীনদুঃখী অথবা সাধু-সন্ত আসুক না কেন, কিছুদিন ওখানে থাকতে পারবে এবং দেবতার প্রসাদ পাবে। মন্দিরের সম্পত্তি দেখাশুনার জন্যে তিনি একজন সৎ এবং যোগ্য লোকের সন্ধান করছিলেন, যিনি মন্দিরের সমস্ত কর্মপদ্ধতি সঠিকভাবে পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন।

এই খবর জেনে বহু লোক ওই ধনী ব্যক্তির কাছে আসতে লাগল, যাতে ওই পদে নিযুক্ত হওয়া যায়। কারণ তারা জানত এই পদে বহাল হলে মোটা টাকা মাইনে পাবে। কিন্তু ধনী ব্যক্তিটি তাদের প্রত্যেককেই ফিরিয়ে দিচ্ছিলেন। তিনি সকলকেই বলছিলেন 'আমার একজন প্রকৃত ভালো লোক দরকার, আমি নিজেই তাকে পরীক্ষা করে নেব।' লোকেরা তাঁকে মনে মনে গালাগালি দিয়ে চলে যেত। অনেকে তাঁকে মূর্খ এমন কি পাগল বলেও মনে করছিল। কিন্তু তিনি ওসব কথায় কান দিচ্ছিলেন না। দেবতার মূর্তি দর্শনের জন্য মন্দিরের দরজা খোলার সময় অসংখ্য দর্শনার্থী বিগ্রহ দর্শনের জন্যে আসত, তখন ওই ধনী

ব্যক্তি নিজের অট্টালিকার ছাদে দাঁড়িয়ে মন্দিরগামী প্রত্যেকটি দর্শনার্থীকে নীরবে নিরীক্ষণ করতেন।

একদিন একজন লোক মন্দিরে দেবমূর্তি দর্শন করতে এল। তার পরনে ছেঁড়া ময়লা কাপড় । সে লেখাপড়াও বিশেষ কিছু জানত না। ঠাকুর প্রণাম করে চলে যাবার সময় ভদ্রলোক তাকে নিজের কাছে ডেকে পাঠালেন। বললেন—'আপনি এই মন্দিরের দেখাশুনার দায়িত্ব নেবেন ?'

লোকটি খুব আশ্চর্য হয়ে বললে—'সে কী ? আমি তো অল্প শিক্ষিত। আমি এত বড় মন্দিরের কাজকর্ম পরিচালনা কী করে করব ?'

ধনী ভদ্রলোক বললেন—'আমার বেশি লেখাপড়া জানা লোকের দরকার নেই। আমি একজন সৎ এবং পরোপকারী লোককে মন্দিরের দায়িত্ব দিতে চাই।'

লোকটি উত্তর দিল—'এত লোক থাকতে আপনি আমাকেই কেন ভালো লোক বিবেচনা করলেন ?'

ধনী ভদ্রলোক বললেন—'আমি জানি আপনি একজন ভালো মানুষ। মন্দিরে যাবার পথের মাঝে একটা ইটের টুকরো মাটিতে পোঁতা ছিল আর তার একটা কানা মাটির উপরে বেরিয়ে ছিল। আমি এখানে অনেকদিন থেকেই লক্ষ করছি ওই ইটে অনেক লোকের পায়ে চোট লাগে। তারা হোঁচট খেয়ে পড়ে যায় কিন্তু ইট সরানোর চেষ্টা না করেই খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলে যায়। আপনার তো ওই ইটে আঘাতও লাগেনি। তবুও আপনি সেটা দেখেই তুলে ফেলবার ব্যবস্থা করলেন। আমি দেখলাম আপনি আমার লোকজনদের কাছ থেকে একটা শাবল চেয়ে নিয়ে ইটের টুকরোটা তুলে দিলেন আর সে

জায়গাটার মাটিটাও পিটিয়ে সমান করে দিলেন।’

লোকটি বললে—‘রাস্তায় পড়ে থাকা কাঁটা, কাঁকর, আর হোঁচট খাওয়ার মতো ইট-পাথরের টুকরো সরিয়ে দেওয়া তো প্রতিটি মানুষের অবশ্য কর্তব্য, আমি তো সেটুকুই করেছি মাত্র।’

এই শুনে তিনি বললেন—‘নিজের কর্তব্য কী, তা জানা এবং পালন করাই তো প্রকৃত ভালো লোকের লক্ষণ।’

সব কিছু ভেবেচিন্তে ধনী ভদ্রলোক ওই সাধারণ অথচ বিবেক-বিবেচনাসম্পন্ন ব্যক্তিকেই মন্দিরের কাজে বহাল করলেন। এই কাজ যে কতটা সঠিক হয়েছিল তা পরবর্তীকালে মন্দিরের শ্রীবৃদ্ধি এবং সুব্যবস্থাই প্রমাণ করে দিয়েছিল।

০

সজ্জন কাঠুরিয়া

মঙ্গল নামে এক সরল এবং সৎ ব্যক্তি ছিল। সে ছিল খুব গরিব। সারাদিন বনে বনে ঘুরে শুকনো কাঠ কাটত আর সন্ধেবেলায় সেগুলি বেঁধে মাথায় করে বাজারে নিয়ে এসে বিক্রি করত। কাঠ বিক্রি করে যা পেত তাই দিয়ে সে আটা নুন ইত্যাদি নিয়ে বাড়ি ফিরত। নিজের পরিশ্রমে উপার্জিত অন্নেই সে সুখী ছিল।

একদিন মঙ্গল তার কুড়ুলটা ঘাড়ে নিয়ে কাঠ কাটতে বনে গেল। একটা গাছের শুকনো ডাল কাটবার জন্যে সে গাছের উপরে উঠে বসল। গাছটা ছিল একেবারে নদীর কিনারায়। ডাল কাটতে কাটতে তার কুড়ুলের বাঁটটা আলগা হয়ে কুড়ুলটা নদীর জলে পড়ে গেল। মঙ্গল গাছ থেকে নেমে এসে কুড়ুলটা খুঁজতে সেই নদীতে বারকয়েক ডুব দিল, কিন্তু কুড়ুলটা খুঁজে পেল না। তখন সে কুড়ুলের দুঃখে মাথায় হাত দিয়ে নদীর ধারে বসে কাঁদতে লাগল। অন্য একটা কুড়ুল কেনার পয়সা তার ছিল না। অথচ কুড়ুল ছাড়া সে কী ভাবেই বা নিজের এবং পরিবারের অন্নসংস্থান করবে। এই ভেবে মঙ্গল খুবই চিন্তায় পড়ে কাঁদতে লাগল।

মঙ্গলের এই অবস্থা দেখে বনদেবতার খুব দয়া হল। তখন বন দেবতা একটি ছোট্ট বালকের রূপ ধরে এসে মঙ্গলের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন—‘ভাই! তুমি কাঁদছ কেন?’

মঙ্গল ছেলেটিকে জোড় হাত করে বলল—'আমার কুড়ুলটা নদীর জলে পড়ে গেছে। আজ আমি কী করে কাঠ কাটব আর
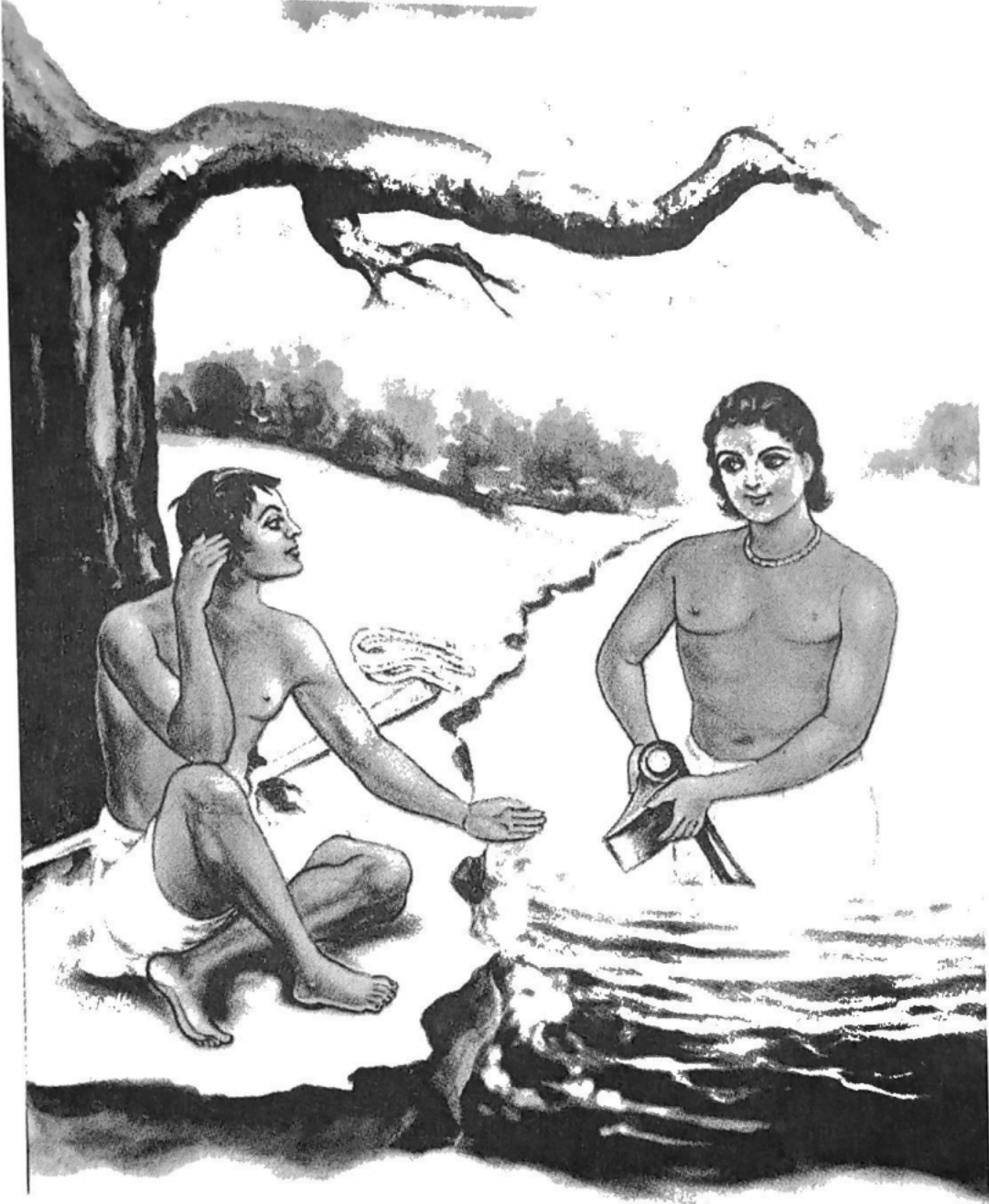
ছেলেমেয়েদের জন্য কী করে খাওয়ার জোগাড় করব, এই ভাবনায় কাঁদছি।'

দেবতা বললেন—'তুমি কেঁদো না। আমি তোমার কুড়ুল খুঁজে দিচ্ছি।'

এই বলে বনদেবতা নদীর জলে ডুব দিয়ে একটি সোনার কুড়ুল তুলে নিয়ে এলেন আর মঙ্গলকে বললেন—'এই নাও

তোমার কুড়ুল।’

মঙ্গল মাথা তুলে দেখে বললে—‘এ কুড়ুল আমার নয়। আমি গরিব লোক। সোনার কুড়ুল কেনবার এত পয়সা আমার কোথায় ?’

দেবতা দ্বিতীয়বার নদীতে ডুব দিয়ে এবার একখানি রুপোর কুড়ুল তুলে এনে মঙ্গলকে দিয়ে বললেন—‘এই নাও তোমার কুড়ুল।’

মঙ্গল বললে—‘বাবা ! আমার ভাগ্য বড়ই খারাপ। আপনি আমার জন্যে অনেক কষ্ট করছেন। কিন্তু আমার কুড়ুলটি পাওয়া যাচ্ছে না। আমার কুড়ুলটা তো অতি সাধারণ লোহার কুড়ুল ছিল।’

বনদেবতা তৃতীয়বার নদীতে ডুব দিয়ে মঙ্গলের লোহার কুড়ুলটি তুলে নিয়ে এলেন। মঙ্গল এবার খুব খুশি। দেবতাকে সে ধন্যবাদ জানিয়ে নিজের কুড়ুলখানি হাতে তুলে নিল। বনদেবতা মঙ্গলের সততা দেখে খুব সন্তুষ্ট হলেন। তিনি বললেন—‘আমি তোমার সততায় খুব খুশি হয়েছি। আমি তোমাকে সোনা এবং রুপোর কুড়ুল দুটিও দিলাম।’

সোনা আর রুপোর কুড়ুল দুটি পেয়ে মঙ্গল বড়লোক হয়ে গেল। এখন সে কাঠ কাটতে আর বনে যায় না। সে কথা জানতে পেরে মঙ্গলের প্রতিবেশী গোবরা মঙ্গলকে জিজ্ঞাসা করে—‘ভাই ! তুমি এখন আর কাঠ কাটতে যাও না কেন ?’ সরলমতি মঙ্গল জঙ্গলের সব ঘটনা গোবরাকে একে একে বলে দিল। লোভী গোবরা সোনা, রুপোর কুড়ুলের লোভে, পরের দিন নিজের কুড়ুল নিয়ে ওই বনেই কাঠ কাটতে গেল। সে ওই গাছটাতেই চড়ে কাঠ কাটতে আরম্ভ করে দিল আর ইচ্ছে করে নিজের কুড়ুলটি নদীতে ফেলে দিয়ে গাছের নিচে বসে কাঁদতে লাগল।

বনদেবতা গোবরার কান্না শুনে পুনরায় উপস্থিত হলেন এবং গোবরার কাছে তার কুড়ুল পড়ে যাবার ঘটনা শুনে নদীতে ডুব দিয়ে একটি সোনার কুড়ুল তুলে আনলেন। সোনার কুড়ুল দেখে গোবরা আনন্দে চেঁচিয়ে উঠে বললে—'এই তো আমার কুড়ুল।'

বনদেবতা বললেন—'তুমি মিথ্যা কথা বলছ ; এ তোমার কুড়ুল নয়।' দেবতা তখন কুড়ুলটি নদীতে আবার ফেলে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

লোভের বশে গোবরা নিজের কুড়ুলটিও হারাল। তখন সে মনের দুঃখে চোখের জল ফেলতে ফেলতে বাড়ি ফিরে এল আর মনে মনে বলতে লাগল আমার লোভের ফলেই এমন সাজা হল।

——— ॰ ———

লোভী রাজা

ইউরোপে ইউনান নামে এক দেশে প্রাচীনকালে মিডাস নামে এক রাজা রাজত্ব করত। রাজা মিডাসের লোভ ছিল প্রবল। নিজের ছেলেমেয়েদের ছাড়া যদি পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় কোনো জিনিস ভালোবাসত তো তা ছিল সোনা। রাত্রে ঘুমুতে ঘুমুতে স্বপ্নে দেখত, সে যেন ঘড়া ঘড়া সোনা সঞ্চয় করেছে।

একদিন রাজা মিডাস তার ধনাগারে যত সোনার ইট আর আসরফি (গিনি) ছিল সেগুলি গুনে রাখছিল। হঠাৎ সেখানে এক দেবদূতের আবির্ভাব হল। দেবদূত রাজাকে বললেন—'মিডাস ! তুমি তো খুব ধনবান ব্যক্তি দেখছি।'

মিডাস ঘাড় ঘুরিয়ে জবাব দেয়—'আমি আর ধনবান কোথায় ? আমার কাছে তো অতি সামান্য সোনা আছে।'

দেবদূত বলল—'তোমার এত সোনা থাকতে তুমি অভাববোধ করছ ? তোমার কত সোনা দরকার আমাকে বল।'

রাজা বলল—'আমি তো চাই আমি যাতেই হাত দেব তাই যেন সোনা হয়ে যায়।'

দেবদূত হেসে উঠে বললেন—'আচ্ছা ! ঠিক আছে, তাই হবে। কাল সকাল থেকে তুমি যেটাই স্পর্শ করবে সেটাই সোনা হয়ে যাবে।' এই বলে দেবদূত অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

ওই দিন রাত্রে মিডাসের চোখে ঘুম এল না। খুব সকালে বিছানা থেকে উঠেই সে একটা চেয়ারে হাত ঠেকাল আর সঙ্গে সঙ্গে চেয়ারটা সোনার হয়ে গেল। তারপর একটা টেবিলকে স্পর্শ করল, সেটাও সোনার হয়ে গেল। রাজা মিডাস খুশিতে ফেটে পড়ল এবং আনন্দে নাচতে আরম্ভ করে দিল। সে পাগলের মতো দৌড়াদৌড়ি করতে লাগল তারপর বাগানে দৌড়ে গিয়ে সে গাছগুলোতে হাত ছোঁয়াল। ফুল পাতা ডালপালা ফুলের সাজি ইত্যাদি সবকিছুই তার স্পর্শমাত্রই সোনা হয়ে যেতে লাগল। সব জিনিস ঝকমক করতে লাগল। মিডাসের এত সোনা জমতে লাগল যে তার কূলকিনারা থাকল না।

চারিদিকে ছুটে বেড়িয়ে মিডাস হাঁপিয়ে উঠল। মিডাসের খেয়াল নেই যে তার পরনের পোশাকগুলো পর্যন্ত সোনা হয়ে ভারি হয়ে উঠেছে। তার ক্ষুধা আর পিপাসা অনুভব হল। বাগান থেকে সে নিজের মহলে ফিরে এসে একটা সোনার চেয়ারে বসল এবং খাবার দেবার জন্য হুকুম করল। একজন পরিচারক তখনই খাবার ভর্তি থালা আর জলের গ্লাস নিয়ে এসে তার সামনে টেবিলে রাখল। কিন্তু যেমনি মিডাস খাবারে হাত দিয়েছে অমনি সব খাবার সোনার হয়ে গেল। জল খাবার জন্যে যেমনি গ্লাসে হাত দিয়েছে অমনি গ্লাস এবং জল দুই‌ই সোনা হয়ে গেল। মিডাসের সামনে সোনার রুটি, সোনার ভাত, সোনার আলু সব সাজানো আছে সে কিছুই খেতে পারছে না। কিন্তু ক্ষুধা আর পিপাসায় সে কাতর হয়ে পড়েছে। সোনায় তো আর ক্ষুধা-তৃষ্ণা মিটবে না, খাদ্য চাই।

মিডাস কাঁদতে লাগল। সেই সময় মিডাসের ছোট্ট মেয়েটি খেলতে খেলতে সেখানে এসে হাজির হল। সে তার বাবার কান্না দেখে দৌড়ে গিয়ে মিডাসের কোলে চেপে তার চোখের জল মোছাতে গেল।

মিডাসও মেয়েকে বুকে চেপে ধরতে গেল। কিন্তু হায়রে ! তখন তার কোলে মেয়ে কোথায় ? মিডাসের কোলে তখন ভারী একটা

সোনার পুতুল যা সে কোলে রাখতেই পারছে না। বেচারা মিডাস ! মাথা ঠুকে ঠুকে সে কাঁদতে লাগল। এই দেখে দেবদূতের দয়া হল। তিনি আবার মিডাসের সামনে এসে দেখা দিলেন। তাঁকে দেখেই মিডাস তাঁর পায়ে আছড়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল—'আপনি আপনার বর ফিরিয়ে নিন।'

দেবদূত জিজ্ঞাসা করলেন—'মিডাস ! তোমার আরও সোনা

চাই ? মিডাস বলো তো ! এক গ্লাস জল মূল্যবান, না সোনা ? এক টুকরো রুটি না সোনা ?'

মিডাস হাত জোড় করে বলতে লাগল—'আমার আর সোনা চাই না। আমি বুঝতে পেরেছি মানুষের কাছে সোনা আবশ্যক বস্তু নয়। সোনা না থাকলেও মানুষের কোনো কাজ আটকায় না; কিন্তু এক গ্লাস জল আর এক টুকরো রুটি ছাড়া মানুষের কোনোভাবেই চলবে না। আর আমি সোনার লোভ করব না।'

দেবদূত মিডাসকে এক বাটি জল দিয়ে বললেন—'এই জল সব জিনিসের উপরে ছিটিয়ে দাও।'

মিডাস সেই জল নিয়ে নিজের মেয়ের গায়ে, চেয়ার, টেবিল, খাবার থালা, জলের গ্লাস থেকে শুরু করে বাগানের গাছপালা, যা যা তাঁর হাতের স্পর্শে সোনার হয়ে গিয়েছিল, সব জিনিসের ওপর ওই জল ছিটিয়ে দিল। দেখতে দেখতে সব জিনিস আগের মতো, যেমন ছিল তেমনি হয়ে গেল।

বেশি লোভ করা ভালো নয়,
তাতে ভালোর চেয়ে মন্দ হয়।

——— • ———

৪ বিচার করে কাজ কোরো

এক কৃষক একটা নেউল পুষেছিল। নেউলটা ছিল খুব বুদ্ধিমান আর প্রভুভক্ত। একদিন কৃষক তার কাজে বাইরে কোথাও গিয়েছিল। কৃষকের বউ তার শিশুপুত্রকে দুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে ঘরের মেঝেতে শুইয়ে দিল। তারপর ঘড়া আর দড়ি নিয়ে কুয়ো থেকে জল আনতে বেরিয়ে গেল। নেউলটা বাড়িতে ছাড়া ছিল।

কৃষকের বউ বাইরে যাবার পরই সেখানে একটা কেউটে সাপ গর্ত থেকে বেরিয়ে এল। শিশুটিকে ঘরের মেঝেতে যেখানে শোয়ানো ছিল সাপটা ওই দিকেই আসতে লাগল। তাই দেখে নেউলটা সাপটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সাপে-নেউলে বেশ কিছুক্ষণ লড়াই চলার পর নেউলটা সাপটাকে দাঁত দিয়ে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলল। তারপর বাড়ির সদর দরজায় বসে দেখতে লাগল কৃষকের বউ আসছে কিনা।

ওদিকে কৃষকের বউ কুয়োতলায় আর পাঁচজনের সঙ্গে গল্পে মেতে উঠেছে, বাড়ির কথা তার খেয়ালই নেই। যখন তার মনে পড়ল সে অনেকক্ষণ আগে তার ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে এসেছে তখন তাড়াতাড়ি জলের ঘড়া নিয়ে বাড়ির দিকে ছুটে চলল। সে এসেই দরজার সামনে নেউলটাকে দেখতে পেল। নেউলের মুখে রক্ত লেগে থাকতে দেখে বউটি মনে করল, নেউলটা নিশ্চয়ই তার শিশুপুত্রটিকে কামড়ে দিয়েছে। দুঃখে আর রাগে সে জলভর্তি ঘড়াটা নেউলটার

উপরে ছুঁড়ে মারল। বেচারা নেউল ঘড়ার আঘাতে একেবারে মরেই গেল।

কৃষকের বউ ছুটে ঘরের মধ্যে এসে দেখে তার সন্তান আরামে

শুয়ে ঘুমুচ্ছে, আর পাশেই একটা কেউটে সাপ টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে রয়েছে। কৃষকের বউ নিজের ভুল বুঝতে পেরে দৌড়ে নেউলটার কাছে গেল আর মরা নেউলটাকে কোলে তুলে নিয়ে খুব কাঁদতে লাগল। কিন্তু তখন কাঁদলে আর কী হবে! এজন্যে কথায় বলে—

'ভাবিয়া করিয়ো কাজ, করিয়া ভাবিয়ো না।'

——— ∘ ———

দয়ার পুরস্কার

বাদশাহ সবুক্তগীন প্রথম জীবনে খুব গরিব ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন সাধারণ সৈনিক। একদিন কী খেয়াল হল তিনি বন্দুক কাঁধে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বনে শিকার করতে গেলেন। সেদিন তাঁকে খুব পরিশ্রম করতে হয়েছিল, ফলে তিনি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। অনেকদূর যাবার পর তাঁর চোখে পড়ল একটা মা-হরিণ তার শিশু-শাবককে নিয়ে বেড়াচ্ছে। সবুক্তগীন তাঁর ঘোড়া নিয়ে সেদিকে ছুটলেন।

মা-হরিণটা তাঁকে দেখে প্রাণভয়ে দৌড়ে গিয়ে একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। কিন্তু তার ছোট্ট শাবকটি পিছনে পড়ে রইল। সবুক্তগীন হরিণ-শাবকটাকে ধরে তার পাগুলো ভালো করে দড়ি দিয়ে বেঁধে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে নিলেন। তারপর অনেক খুঁজে মা-হরিণটাকে না পেয়ে শাবকটিকে নিয়েই বাড়ির দিকে রওনা হলেন।

মা-হরিণটা দেখল তার সন্তানকে নিয়ে শিকারি চলে যাচ্ছে। তখন সে সন্তানের মায়ায় ঝোপ থেকে বেরিয়ে সবুক্তগীনের ঘোড়ার পিছু পিছু ছুটতে লাগল। অনেকদূর যাবার পর সবুক্তগীন পিছন ফিরে আশ্চর্য হয়ে দেখলেন মা-হরিণটা পিছনে পিছনে দৌড়ে আসছে।

সবুক্তগীনের খুব দয়া হল। তিনি হরিণ-শাবকটার পাগুলো খুলে ঘোড়া থেকে নামিয়ে দিলেন। হরিণটাও তার সন্তানকে পেয়ে খুশি হয়ে জঙ্গলের দিকে চলে গেল।

সেদিন বাড়ি ফিরে রাত্রিবেলা সবুক্তগীন এক সুন্দর স্বপ্ন দেখলেন। ঘুমের মধ্যে তাকে যেন কোনো এক দেবদূত বলছেন—'সবুক্তগীন! আজ তুমি এক হরিণীকে যে দয়া করেছ তার জন্যে আমি খুশি হয়ে তোমার নামটা বাদশাহদের তালিকায় লিখে নিয়েছি। তুমি একদিন বাদশাহ হবে।'

সবুক্তগীনের স্বপ্ন একদিন সার্থক হয়েছিল। তিনি পরবর্তীকালে সত্যিই বাদশাহ হয়েছিলেন। একটা হরিণীকে দয়া করে সবুক্তগীনের এত বড় ফলপ্রাপ্তি হয়েছিল।

যারা জীবে দয়া করে তাদের প্রতি ঈশ্বর সর্বদাই খুশি হন এবং উপযুক্ত প্রতিদান দেন।

জীবে প্রেম করে যেই জন

সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

——— ০ ———

পিতা ও পুত্র

এক যুবক পিতা তার শিশুপুত্রকে কোলে নিয়ে ঘরের বারান্দায় বসেছিলেন। এমন সময় কোথা থেকে একটা কাক উড়ে এসে তাদের প্রাচীরের উপর বসল। পুত্র পিতাকে জিজ্ঞাসা করল—‘বাবা ওটা কী ?’

পিতা উত্তর দিলেন—‘ওটা একটা কাক।’
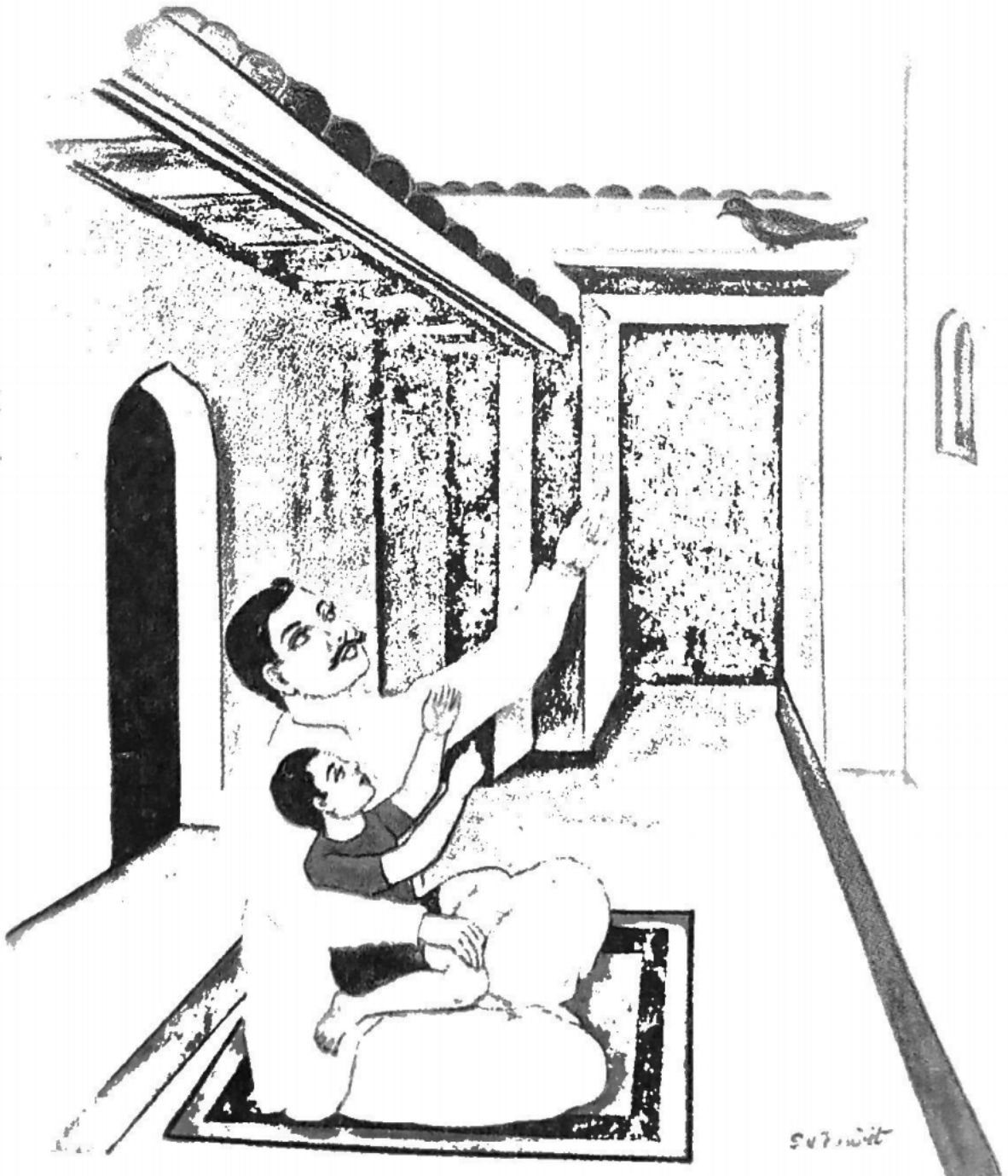
ছেলে আবার বলল—'বাবা, ওটা কী ?'

পিতা ফের উত্তর দিলেন—'ওটা একটা কাক।'

ছেলে আবার জিজ্ঞাসা করল—'বাবা, ওটা কী ?'

বাবা এবারও আদর করে বললেন—'ওটা একটা কাক।'

এরপর অনেক বছর কেটে গেল। ছেলে এখন যুবক হয়ে উঠেছে আর বাবা বৃদ্ধ হয়েছেন। বাবা একদিন চাটাই-এর উপর বসে আছেন, এমন সময় বাড়িতে তার ছেলের সঙ্গে দেখা করতে কেউ এসেছে। বাবা ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন—'কে এসেছে রে ?'

ছেলে যে এসেছে তার নাম বলল। কিছুক্ষণ পর আবার একজন এলে বাবা জিজ্ঞাসা করলেন—'কে এল রে।' এবার ছেলে রেগে উঠে বলল—'তুমি চুপচাপ থাকতে পারছ না ? ঘরে তো কিছু করতে হয় না। কে এল, কে গেল এই নিয়ে সারাদিন কেন ঘ্যানর ঘ্যানর করছ ?'

বাবার দীর্ঘশ্বাস পড়ল। হাত দিয়ে মাথাটা টিপে ধরে খুব দুঃখের সঙ্গে আস্তে আস্তে বললেন—'আমি একবার জিজ্ঞাসা করাতেই তুই রেগে গেলি, আর তুই হাজার বার আমাকে একই কথা জিজ্ঞাসা করতিস— এটা কী, ওটা কী ? আমি কোনোদিন তাতে বিরক্ত হইনি। আমি বারবার উত্তর দিয়েছি—এটা একটা কাক, ওটা একটা কাক।'

বাবা এবং মাকে যেসব ছেলেরা তিরস্কার করে তাদের লোকে খুব খারাপ ছেলে বলে। তাদের সবাই অপছন্দ করে। তোমরা সর্বদা এ কথা মনে রাখবে যে বাবা-মা তোমাদের বড় করে তুলতে অনেক কষ্ট করেছেন আর তোমাদের অফুরন্ত স্নেহ ভালোবাসা দিয়েছেন।

———•———

৭ ভগবান সর্বত্রই আছেন

গোবিন্দমোহন তার ছেলে গোপালকে প্রত্যেক দিন শোবার আগে গল্প শোনাত। একদিন সে ছেলেকে গল্প শুনিয়ে বলল—'বাবা! একটা কথা কখনো ভুলিস না, ভগবান সব জায়গায় আছেন।'

গোপাল এদিক ওদিক তাকিয়ে বাবাকে জিজ্ঞাসা করল—'বাবা! ভগবান সব জায়গাতেই আছেন ? কিন্তু তাঁকে তো আমি দেখতে পাচ্ছি না।'

গোবিন্দমোহন বললে—'আমরা ভগবানকে দেখতে পাই না, কিন্তু উনি সব জায়গায় আছেন আর আমাদের সব কাজ দেখতে পান।'

গোপাল তার বাবার কথা অক্ষরে অক্ষরে মনে রেখেছিল। কিছুদিন পর আকাল দেখা দিল। গোবিন্দমোহনের খেতে কোনো ফসল হয়নি। সংসারে অভাব চলছিল। সে একদিন গোপালকে সঙ্গে নিয়ে রাতের অন্ধকারে গাঁয়ের বাইরে গেল। তারপর অপর এক চাষীর খেত থেকে চুরি করে একবোঝা ধান কেটে নিয়ে আসবে এরকম মতলব করল। গোপালকে আলের মাথায় দাঁড় করিয়ে রেখে সে বলল—'তুই চারদিকটা দেখ। যদি কেউ এদিকে আসে তো আমাকে বলবি।'

এই বলে গোবিন্দমোহন যেই-না ধান কাটতে বসেছে অমনি গোপাল বলে ওঠে—'বাবা! থাম।'

গোবিন্দমোহন জিজ্ঞাসা করল—'কেন রে? কেউ দেখছে নাকি?'

গোপাল বলল—'হ্যাঁ, দেখছে।'

গোবিন্দমোহন জমি থেকে উঠে আলের কাছে চলে এল। তারপর চারিদিকে দেখতে লাগল কিন্তু কোনো দিকে কাউকে দেখতে না পেয়ে ছেলেকে জিজ্ঞাসা করল—'কই রে। কেউ তো নেই, কে দেখছে ?'

গোপাল বলল—'তুমিই তো বলেছিলে ভগবান সব জায়গাতেই আছেন আর আমাদের সব কাজ দেখছেন। তবে উনি কেন তোমাকে অপরের ধান চুরি করতে দেখতে পাবেন না ?'

গোবিন্দমোহন ছেলের কথা শুনে খুব লজ্জায় পড়ে গেল, আর চুরির পরিকল্পনা মন থেকে মুছে ফেলে গোপালকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরে এল।

— • —

বন্ধুর পরামর্শ

হরিহর নামে একজন ধনী চাষী ছিল। সে ছিল অত্যন্ত অলস। হরিহর না যেত তার জমির চাষ-আবাদ দেখতে, না যেত খামার দেখাশোনা করতে। সে তার গোরু-মোষগুলোর পর্যন্ত কোনো খোঁজ খবর রাখত না বা ঘর-সংসারের কাজকর্মও কিছু দেখাশোনা করত না। সব কাজ সে চাকরবাকরদের ভরসায় ছেড়ে দিয়ে অলসভাবে দিন কাটাত। তার অলসতা আর ত্রুটিপূর্ণ পরিচালন ব্যবস্থার ফলে সংসারের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়ল। তার চাষবাসের যেমন ক্ষতি হতে লাগল তেমনি গোরুর দুধ-ঘি থেকেও কোনো লাভ হচ্ছিল না।

একদিন হরিহরের বন্ধু তিনকড়ি ওর বাড়িতে বেড়াতে এল। তিনকড়ি এসে হরিহরের ঘরের বেহাল অবস্থা দেখে মনে ব্যথা পেল এবং বুঝল যে হরিহরকে মুখের কথায় বোঝালে সে তার স্বভাব বদলাবে না। তাই তার বন্ধু হরিহরের ভালোর জন্যে তাকে বলল— 'ভাই! তোমার শোচনীয় অবস্থা দেখে আমার কষ্ট হচ্ছে। তোমার এই অভাব দূর করার এক সহজ উপায় আমার জানা আছে।'

হরিহর বলল—'দয়া করে তুমি সেই উপায় আমাকে বলে দাও। আমি নিশ্চয় তা পালন করব।'

তিনকড়ি বলল—'পাখিরা সব যখন ঘুম থেকেও জাগে না তখন মানস সরোবর থেকে একটা সাদা রাজহাঁস রোজ এই পৃথিবীতে নেমে

আসে আর দুপুর পর্যন্ত এখানে থাকে, তারপর ফিরে যায়। কিন্তু ঠিক জানি না যে হাঁসটা কবে আর কোথায় আসবে। তবে যে লোক তার একবার দেখা পায় তার কোনো দিন কোনো অভাব হয় না।'

হরিহর বললে—'যাই ঘটুক না কেন, আমি ওই হাঁসটাকে দেখবই।'

তিনকড়ি চলে গেল। হরিহর পরের দিনই খুব ভোরে উঠে পড়ল।

তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে হাঁসের খোঁজে প্রথমে খামারের দিকে গেল, সেখানে তার নজরে পড়ল একটা লোক তার গোলা থেকে গম বার করে নিজের বস্তায় ভরার চেষ্টা করছে। হরিহরকে দেখে লোকটা লজ্জা পেয়ে তার কাছে ক্ষমা চাইতে লাগল।

খামার থেকে সে ঘরে ফিরে এল এবং গোয়ালের দিকে গেল। ওখানে গিয়ে দেখে রাখালটা গোরুর দুধ দুয়ে, দুধটা তার বৌ-এর

ঘটিতে ঢেলে দিচ্ছে। হরিহর রাখালকে খুব ধমকাল। ঘরে এসে জলখাবার খেয়ে হাঁসের খোঁজে সে আবার বেরিয়ে পড়ল। এবার গেল সোজা জমির দিকে। হরিহর দেখল খেতে এখন পর্যন্ত কোনো মজুর কাজ করতে আসেনি। সে ওখানে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর মজুররা যখন এল, তখন কাজে আসতে দেরি করার জন্য তাদের খুব বকাবকি করল। এইভাবে সে যেখানেই যায় সেখানেই চুরি কিংবা কাজে ফাঁকি লক্ষ করে।

সাদা হাঁসের খোঁজে হরিহর রোজ ভোরে উঠতে লাগল। আর ঘুরতে লাগল। সেই থেকে তার কাজের লোকজন ঠিকমতো কাজ করতে লাগল। তার খামারে, গোয়ালে চুরি, কাজ ফাঁকি ইত্যাদি সব বন্ধ হয়ে গেল। আগে সে অসুস্থ ছিল এখন তার স্বাস্থ্যও ভালো হয়ে গেল। যে জমিতে সে আগে দশ মণ ধান পেত এখন সেই জমি থেকে পঁচিশ মণ ধান পেতে লাগল। গোয়াল থেকেও প্রচুর পরিমাণে দুধ পেতে লাগল।

তিনকড়ি আবার একদিন হরিহরের ঘরে এল। হরিহর বলল— 'বন্ধু ! সাদা হাঁস তো আজ পর্যন্ত দেখতে পেলাম না কিন্তু ওটার খোঁজে গিয়ে আমার খুব উপকার হয়েছে।'

তিনকড়ি হেসে বলল—'পরিশ্রম করাটাই আসলে সাদা হাঁস। পরিশ্রমের পাখি সাদা ঝকঝকে। যে নিজে দেখাশোনা না করে চাকর-বাকরদের উপর সব ছেড়ে দেয় তার ক্ষতিই হয়। আর যে নিজে পরিশ্রম করে বা নিজে লোকজনদের কাজের দেখাশোনা করে সে ধনসম্পত্তি এবং সম্মান দুইই লাভ করে।'

——— • ———

৯

স্বর্গ দর্শন

হরি খুব সরল বালক। সে প্রতিদিন শোবার আগে ঠাকুরমাকে গল্প শোনাতে বলত। ঠাকুরমাও তাকে নাগলোক, পাতাল, গন্ধর্বলোক, চন্দ্রলোক, সূর্যলোক ইত্যাদির অনেক গল্প শোনাতেন। একদিন তার ঠাকুরমা তাকে স্বর্গলোকের কথা শোনাচ্ছিলেন। এমন সুন্দর স্বর্গের বর্ণনা যা শুনে হরি স্বর্গ দেখার জন্যে ঝোঁক ধরল। ঠাকুরমা তো তাকে অনেক করে বোঝালেন যে, মানুষ স্বর্গ দেখতে পায় না ; তবু হরি খুব কাঁদতে লাগল। কাঁদতে কাঁদতে সে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমুতে ঘুমুতে সে স্বপ্নে দেখতে পেল খুব উজ্জ্বল আলোকময় এক দেবতা তার সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন—'খোকা ! স্বর্গ দেখতে হলে মূল্য দিতে হয়। তুমি সার্কাস দেখতে গেলে টিকিটের পয়সা দাও তো ? স্বর্গ দেখতে হলেও ওই রকম মূল্য দিতে হবে।'

স্বপ্নের মধ্যেই হরি চিন্তা করল যে ঠাকুরমার কাছে তাহলে টাকা চাইব। কিন্তু দেবতা বললেন—'স্বর্গে তোমার জিনিস কেনার টাকা চলবে না, ওখানে সততা এবং পুণ্যের ফল মূল্য হিসেবে দিতে হয়। আচ্ছা ! তুমি এই কৌটোটা নিজের কাছে রাখ। যেদিন তুমি খুব ভালো কাজ করবে সেদিন দেখবে এর ভিতরে একটি টাকা এসে জমা হবে। আর যেদিন কোনো খারাপ কাজ করবে সেদিন এর থেকে টাকাটা চলে যাবে। এইভাবে যেদিন এই কৌটোটা ভর্তি হয়ে যাবে সেদিন তুমি স্বর্গ দেখতে পাবে।'

হরির ঘুম ভেঙে গেল। সে দেখতে পেল বালিশের পাশে সত্যি সত্যি একটা কৌটো রয়েছে। কৌটোটা পেয়ে ওর খুশি আর ধরে না। ওইদিন ওর ঠাকুমা ওকে একটা টাকা দিল। টাকা নিয়ে হরি ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা বাজারে গেল। একটা রুগ্ন ভিখারি তার কাছে ভিক্ষা চাইল। হরি ভিখারিকে কিছু না দিয়ে চলে যাবে ভাবল। এমন সময় তার চোখে পড়ল স্কুলের মাস্টারমশাই আসছেন। মাস্টারমশাই উদার মনোভাবের খুব প্রশংসা করতেন। তাঁকে দেখে হরি টাকাটা ভিখারিটির হাতে দিয়ে দিল। তাই দেখে মাস্টারমশাই হরির পিঠ চাপড়ে খুব বাহবা দিলেন।

ঘরে ফিরে এসে হরি কৌটো খুলে দেখলো ওটা খালিই পড়ে আছে। হরির খুব দুঃখ হল। ও কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ল। সেদিন স্বপ্নে আবার সেই দেবতা দেখা দিলেন আর বললেন—'তুমি মাস্টারমশাই-এর কাছ থেকে প্রশংসা পাবার লোভে ভিখারিটিকে টাকা দিয়েছিলে। তাই প্রশংসা তো পেয়েই গেছ। তাহলে আর কাঁদছ কেন ? যে লোক কোনো কিছু লাভের আশায় ভালো কাজ করে সে তো ব্যবসাদারি করে। তার সঙ্গে পুণ্যের কী সম্পর্ক ?'

পরের দিন হরি ঠাকুমার কাছে আবার একটা টাকা নিয়ে বাজারে গেল। বাজার থেকে সে দুটো কমলালেবু কিনল। হরির বন্ধু চুনি খুব অসুস্থ শুনে বাজার থেকে ফেরার পথে সে বন্ধুকে দেখতে ওদের বাড়ি গেল। সে সময় চুনিকে দেখতে ওদের ঘরে ডাক্তার এসেছিল। ডাক্তার ওষুধ দিয়ে চুনির মাকে বললেন—'একে আজ কমলালেবুর রস খেতে দেবেন। চুনিরা ছিল খুব গরিব। তার মা কাঁদতে কাঁদতে বললেন—'আমি পরের ঘরে ঝি খেটে খাই। এ সময় আমি ছেলের অসুখের জন্যে কদিন কাজেই যেতে পারিনি। আমার কাছে লেবু

কেনার একটা পয়সাও নেই।'

হরি নিজের দুটো লেবুই চুনির মাকে দিয়ে দিল। চুনির মা তাকে খুব আশীর্বাদ করলেন। ঘরে এসে যখন হরি তার কৌটোটা খুলল তখন দেখল তাতে দুটো টাকা চকচক করছে।

আর একদিন হরি খেলা করছিল আর ওর ছোট বোন এসে ওর খেলনাগুলো কেড়ে নিল। হরি তাকে থামাতে না পেরে খুব মারল। বেচারি ছোট মেয়েটা খুব কাঁদতে লাগল। এবার যখন হরি তার কৌটোটা খুলল তখন দেখল আগের দুটো টাকা নেই। এতে তার খুব মন খারাপ হল। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল জীবনে আর কোনোদিন খারাপ কাজ করবে না।

মানুষ যেমন কর্ম করে তার স্বভাবও সেইরকম হয়। যে অসৎ কাজ করে তার স্বভাবও অসৎ হয়ে যায়। খারাপ কাজেই সে আনন্দ পায়। যে লোক সৎ কর্ম করে তার স্বভাবও সৎ হয়। তার খারাপ কাজ করতে ভালো লাগে না। হরি আগে টাকার লোভে ভালো কাজ করত। আস্তে আস্তে তার স্বভাবটাই ভালো কাজের জন্যে উপযুক্ত হয়ে উঠল। ভালো কাজ করতে করতে তার কৌটোটা দিন দিন টাকায় ভরে উঠল। স্বর্গ দেখার আশায় খুশি হয়ে সে কৌটোটা নিয়ে নিজেদের বাগানে গেল।

হরির চোখে পড়ল একজন বুড়ো সাধু গাছের তলায় বসে বসে কাঁদছে। সে তখন দৌড়ে সাধুর কাছে গেল এবং জিজ্ঞাসা করল—

'বাবা ! তুমি কাঁদছ কেন ?'

সাধুটি বললেন—'বাছা, তোমার হাতে যে কৌটোটি রয়েছে ওইরকম একটা কৌটো আমারও ছিল। বহুদিন যাবৎ পরিশ্রম করে কৌটোটা আমি টাকাতে ভর্তি করেছিলাম। অনেক আশা ছিল ওই

টাকা দিয়ে স্বর্গ দেখব ; কিন্তু আজ গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে কৌটোটা জলে পড়ে গেছে, তাই কাঁদছি।’

হরি বললে—‘বাবা, তুমি কেঁদো না। আমার কৌটোটাও ভরে গেছে। তুমি এটা নাও।’

সাধু বললেন—‘তুমি কত পরিশ্রম করে সঞ্চয় করেছ, এটি দিয়ে দিলে তোমার মনে কষ্ট হবে।’

হরি বলল—‘বাবা, আমার কোনো কষ্ট হবে না। আমি এখন বয়সে ছোট। এরকম অনেক কৌটো টাকা দিয়ে ভরাতে পারব। তুমি

বুড়ো হয়েছ। আবার একটা কৌটো ভরাতে পারবে কিনা ঠিক নেই। তাই তুমি আমার কৌটোটা নাও।’

হরির কাছ থেকে সাধুটি কৌটোটা নিয়ে তার চোখ দুটো হাত দিয়ে চেপে ধরল। হরির চোখ বন্ধ। সে চোখের সামনে দেখল স্বর্গ ভেসে উঠেছে। কী সুন্দর ! ঠাকুমা যে স্বর্গের কথা বলেছিলেন এ যেন তার থেকেও বহুগুণে সুন্দর।

হরি চোখ খুলে দেখল সাধুর বদলে স্বপ্নে দেখা সেই দেবতা তার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। দেবতা বললেন—‘বাছা ! যে লোক ভালো কাজ করে তার স্বর্গে ঠাঁই হয়। তুমি সংসারে এরকম ভালো কাজ করতে থাকলে এই জীবনের শেষে স্বর্গে যাবে।’ দেবতা এই কথা ক’টি বলে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

—— • ——

শ্রেষ্ঠ পুণ্যাত্মা

প্রাচীন কাল থেকে কাশীর নাম সুবিদিত। সংস্কৃত শিক্ষার পুরাতন কেন্দ্র হল এই কাশী। কাশীকে ভগবান বিশ্বনাথের স্থান বা বিশ্বনাথপুরীও বলা হয়ে থাকে। ওখানে বাবা বিশ্বনাথের প্রাচীন মন্দির আছে। একদিন বাবা বিশ্বনাথের পুরোহিত স্বপ্নে দেখলেন যে ভগবান বিশ্বনাথ আদেশ দিচ্ছেন মন্দিরে একদিন বিদ্বান আর ধর্মপ্রাণ লোকেদের এক সভা ডাকার জন্য।

পুরোহিত পরের দিন সকালেই সারা শহরে এই কথা প্রচার করে দিলেন। কাশীর যত বিদ্বান আর সাধু-সন্ত, পুণ্যাত্মা, দানশীল ব্যক্তি ছিলেন তারা সব গঙ্গায় পুণ্য স্নান করে মন্দিরে উপস্থিত হলেন। সকলে বাবা বিশ্বনাথের মাথায় জল ঢাললেন এবং বাবার চারদিক প্রদক্ষিণ করলেন। তারপর সকলে মন্দির চত্বরের মণ্ডপে গিয়ে সমবেত হলেন। সে দিন মন্দিরে ভীষণ ভিড়। সব লোক উপস্থিত হবার পর পুরোহিত সকলকে তার স্বপ্নের কথা বললেন। সকলে তখন— 'হর হর মহাদেব' ধ্বনি দিয়ে মাথায় হাত ঠেকিয়ে শিবের স্তব করতে লাগলেন।

বেশ কিছুক্ষণ পর ঠাকুরের আরতি শেষ হলে, কাঁসর-ঘণ্টার শব্দ বন্ধ হল। তারপর ভক্তদের প্রার্থনা শেষ হলে সকলে দেখলেন মন্দিরের ভিতরটা আলোয় আলোময় হয়ে উঠেছে। বাবা বিশ্বনাথের

মূর্তির কাছে দেখা গেল একটা সোনার পাত, যার ওপরে বড় বড় মূল্যবান রত্ন গাঁথা রয়েছে। ওই সব রত্ন থেকে আসা বর্ণালির আলোয় গোটা মন্দিরের ভিতরটা আলোয় ঝলমল করছে। পুরোহিত ওই রত্ন

গাঁথা সোনার পাতটি তুলে নিয়ে দেখলেন ওর উপর হিরের অক্ষরে লেখা রয়েছে—'শ্রেষ্ঠ দয়ালু এবং পুণ্যাত্মার জন্যে বাবা বিশ্বনাথের এই উপহার।'

পুরোহিত ছিলেন খুব ত্যাগী এবং ঈশ্বরভক্ত মানুষ। উনি ওই পাতখানি নিয়ে সকলকে দেখালেন এবং বললেন—'প্রতি সোমবার

এই মন্দিরে বিদ্বান ব্যক্তিদের সভা বসবে। যিনি সব থেকে শ্রেষ্ঠ পুণ্যাত্মা এবং দয়ালু বলে নিজেকে প্রমাণ করবেন তাঁকে এই স্বর্ণপাতটি দেওয়া হবে।'

দেশের সর্বত্র এই সংবাদ প্রচার হয়ে গেল। দূরদূরান্ত থেকে কত তপস্বী, ত্যাগী, ব্রতধারী এবং দানশীল ব্যক্তি কাশীতে আসতে লাগলেন। এক ব্রাহ্মণ বেশ কয়েক মাস ধরে চন্দ্রায়ন ব্রত পালন করেছিলেন। তিনি ওই স্বর্ণপাতটি নেবার জন্যে এগিয়ে এলেন। কিন্তু তাঁকে ওই স্বর্ণপাতটি দেওয়া মাত্র সঙ্গে সঙ্গে সেটি মাটির পাতে পরিণত হল। ওর জ্যোতি নষ্ট হয়ে গেল। লজ্জায় তিনি পাতটি ফেরত দিলেন। পুরোহিতের হাতে আসার সঙ্গে সঙ্গেই সেটি আবার পূর্বের আকার ধারণ করল আর তার রত্নগুলি আলোয় ঝকমক করে উঠল।

একজন ভদ্রলোক বহু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, বহু জায়গায় সেবাব্রত খুলেছিলেন। আর বিভিন্ন কাজে দানধ্যান করতে করতে তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি খরচ করে দিয়েছিলেন। বহু প্রতিষ্ঠানকে তিনি দান করতেন বলে খবরের কাগজে তাঁর নাম ছাপা হত। তিনিও স্বর্ণপাতটি নিতে এগিয়ে এলেন। কিন্তু কী আশ্চর্য তাঁর হাতে গিয়েও স্বর্ণপাতটি মাটিতে পরিণত হয়ে গেল। পুরোহিত তাঁকে বললেন— 'আপনি পদ, মান আর যশের আকাঙ্ক্ষায় দান করেন। যশের প্রত্যাশায় যাঁরা দান করে তাদের দান শুদ্ধ হয় না।'

এরপরও বহু লোক এল কিন্তু কেউই স্বর্ণপাতটি নিতে পারল না। সবার হাতে গিয়েই সেটি মাটিতে পরিণত হয়ে যেতে লাগল।

এভাবে বেশ কিছুদিন কেটে গেল। বহুলোক স্বর্ণপাতটি পাওয়ার আশায় বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরের কাছেই দানধ্যান আরম্ভ করে দিল

কিন্তু তারাও স্বর্ণপাতটি পেল না।

একদিন এক বৃদ্ধ চাষী বাবা বিশ্বনাথকে দর্শন করতে এল। সে ছিল এক গ্রাম্য চাষা। পরনে তার ছেঁড়া ময়লা কাপড়। সে শুধু বাবা বিশ্বনাথকেই দর্শন করতে এসেছিল। তার কাছে কাপড়ের খুঁটে বাঁধা সামান্য মুড়ি আর একটা ছেঁড়া কম্বল মাত্র ছিল। মন্দিরের কাছে গরিব দুঃখীদের কাপড়, লুচি, মিষ্টি বিলি করা হচ্ছিল। আর মন্দির থেকে বেশ কিছু দূরে একজন কুষ্ঠ-রুগী ভিক্ষা পাবার জন্যে আর্তনাদ করছিল। সে উঠে যেতে পারছিল না। তার সারা দেহ ঘায়ে ভর্তি। খিদেয় ছটফট করছিল কিন্তু তার দিকে কেউ ফিরেও দেখছিল না। বৃদ্ধ চাষীটির দয়া হল। সে তার মুড়িগুলি তাকে খেতে দিয়ে নিজের কম্বলটি ওর গায়ে জড়িয়ে দিল। তারপর সে মন্দিরে ঠাকুর দর্শন করতে এল। মন্দিরের পুরোহিত আগে থেকেই এরকম নিয়ম করেছিলেন যে, যেকোনো যাত্রী সোমবার ঠাকুর দর্শন করতে আসবে সবার হাতেই স্বর্ণপাতটি একবার দেওয়া হবে। বৃদ্ধ চাষীটি যখন বাবা বিশ্বনাথকে দর্শন করে মন্দিরের বাইরে এল তখন পুরোহিত সেই স্বর্ণপাতটি তার হাতে দিলেন। স্বর্ণপাতটি তার হাতে দেওয়া মাত্রই পাতে বাঁধানো রত্নগুলো দ্বিগুণ জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সবাই তখন সেই বৃদ্ধকে ধন্য ধন্য করতে লাগল।

পুরোহিত বললেন—‘এই স্বর্ণপাত বাবা বিশ্বনাথ তোমাকে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি নির্লোভ, যে দীনদুঃখীকে করুণা করে, যে নিঃস্বার্থ ভাবে দান করে আর তাদের সর্বদা সেবা করে সে-ই সব থেকে শ্রেষ্ঠ পুণ্যাত্মা।’

—— ০ ——

১১ লোভের পরিণাম

এক দোকানদার তার খদ্দেরকে মধু বিক্রি করছিল। হঠাৎ দোকানদারের হাত থেকে মধু ভর্তি মাটির হাঁড়িটা পড়ে গেল। হাঁড়িটা ভেঙে যাওয়াতে অনেকটা মধু মাটিতে পড়ে গেল। সে যতটা পারল ওপর ওপর তুলে নিল ; কিন্তু কিছু মধু মাটিতে পড়ে রইল।

মিষ্টি মধুর লোভে মাছিরা দলে দলে এসে মধুর ওপর বসতে লাগল। মিষ্টি মিষ্টি মধু খেতে তাদের খুব ভালো লাগছিল। তাড়াতাড়ি তারা সেটা চেটে খেতে লাগল। যতক্ষণ না তাদের পেট ভরল ততক্ষণ তারা মধু চাটতে থাকল।

যখন মাছিদের পেট ভরে গেল তখন তারা উড়ে পালাবার চেষ্টা করল। কিন্তু তাদের পাখনাগুলো ততক্ষণে মধুতে জড়িয়ে গেছে। ওড়বার জন্যে ওরা যত ছটফট করে ততই ওদের পাখনাগুলো মধুর সঙ্গে জড়িয়ে যেতে লাগল। পাল পাল মাছি মধুতে ছটফট করতে করতে মরে গেল, বহু মাছি মরণের আগে ছটফট করতে লাগল। তবু নতুন নতুন মাছি মধুর লোভে আসা-যাওয়া করছিল। মরা, ছটফট-করা মাছিদের দেখেও তারা মধুর লোভ সামলাতে পারছিল না।

মাছিদের দুর্গতি আর বোকামি দেখে দোকানদার বলল—'যে সকল লোক লোভে পড়ে যায়, তারা এই মাছিদের মতোই মূর্খ।
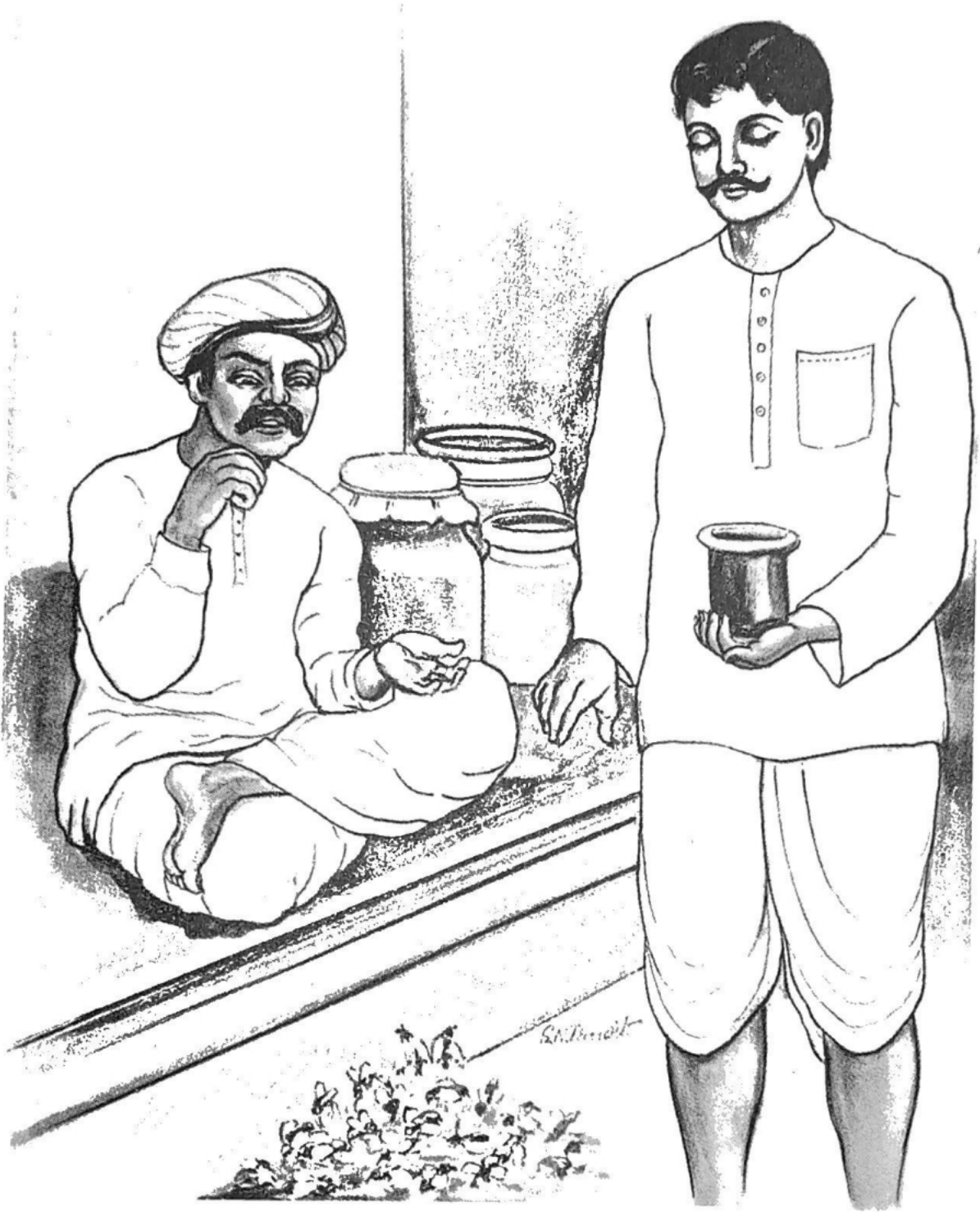
ক্ষণিকের জন্যে সুখের স্বাদ পেতে গিয়ে নিজের স্বাস্থ্য নষ্ট করে, অসুস্থ হয়ে ছটফট করে, আর তাড়াতাড়ি মরণের দিকে এগিয়ে যায়।'

একতাই বল

শিবশংকর নামে এক ব্যক্তি ছিল, তার পাঁচটি ছেলে। তাদের নাম— শিবরাম, শিবদাস, শিবলাল, শিবসহায় আর শিবপূজন। ছেলেরা পরস্পর রোজই ঝগড়া-বিবাদ করত। সামান্য ব্যাপারে প্রত্যেকেই নিজেকে অন্য চার জনের উপরে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইত আর তাতেই বিবাদ বেধে যেত।

শিবশংকর ছেলেদের ঝগড়া দেখে খুব বিব্রত বোধ করত। সে একদিন ছেলেদের সকলকে তার কাছে ডাকল। আগে থেকেই শিবশংকর বেশ কিছু শুকনো বাঁশের কঞ্চি এক সঙ্গে আঁটি বেঁধে রেখে দিয়েছিল। ছেলেদের সে বলল—'বাছারা, তোমাদের মধ্যে থেকে যে এই আঁটিটা ভাঙতে পারবে তাকে এক হাজার টাকা পুরস্কার দেব।'

প্রত্যেকেই আমি আগে ভাঙব বলে এগিয়ে গেল আর তাতেই পাঁচজনের পরস্পর ঝগড়া লেগে গেল। ওরা ভয় পাচ্ছিল যদি অন্য ভাই আগে ভেঙে ফেলে তবে টাকাটা সে পেয়ে যাবে। শিবশংকর বলল—'শোনো, প্রথমে ছোট ভাই শিবপূজনকে ভাঙতে দাও।' শিবপূজন আঁটিটা হাতে তুলে নিল আর গায়ে যত জোর ছিল দাঁতে দাঁত চেপে, চোখ বুজে ওটাকে মচকাতে চেষ্টা করল। তার কপাল ঘেমে গেল কিন্তু শুকনো কঞ্চির আঁটিটা ভাঙতে পারল না। তখন সে আঁটিটা শিবসহায়কে দিল সেও খুব চেষ্টা করল কিন্তু আঁটিটা ভাঙতে

পারল না। এইভাবে প্রত্যেকটি ছেলে একে একে আঁটিটা নিয়ে যত জোর আছে সব দিয়েও আঁটিটা ভাঙতে পারল না।

এবার শিবশংকর আঁটিটা খুলে একটি করে কঞ্চি প্রত্যেক ছেলের হাতে তুলে দিল। এইবার ছেলেরা কঞ্চিগুলো সহজেই ভেঙে ফেলল। তখন শিবশংকর বলল—'দেখ ! এই কঞ্চিগুলো যতক্ষণ একসঙ্গে ছিল ততক্ষণ তোমরা তা ভাঙতে পারলে না, আর যখন আলাদা করে দিলাম তখনই তোমরা সহজেই সেগুলি ভেঙে ফেললে। এরকম যদি পরস্পর ঝগড়া কর আর আলাদা আলাদা হয়ে থাক তবে যে কেউ তোমাদের পরাস্ত করবে এবং জব্দ করে রাখবে। পরিবর্তে তোমরা যদি ঝগড়া না করে মিলেমিশে এক হয়ে থাক তবে কেউ তোমাদের শত্রুতা করতে সাহস পাবে না।'

শিবশংকরের ছেলেরা সেই দিন থেকেই পরস্পর ঝগড়া করা ছেড়ে দিয়ে মিলেমিশে বাস করতে লাগল।

——— ॰ ———

ডাক্তার বিদায়

হারুবাবুর ছেলে চন্দনের খুব অসুখ। গ্রীষ্মের দিনে দুপুরে সে
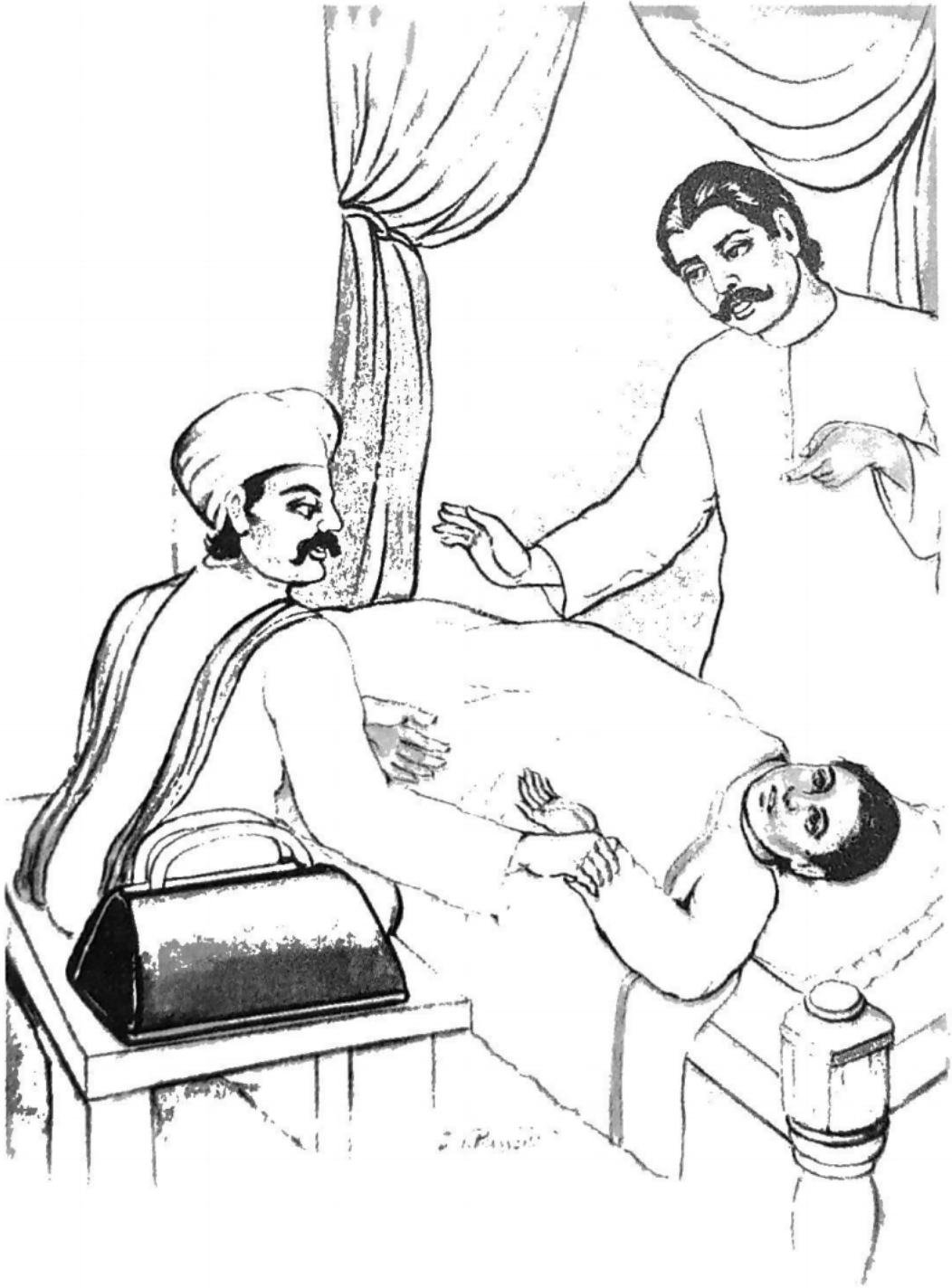
চুপিচুপি ঘর থেকে পালিয়ে আম কুড়ুতে গিয়েছিল আর তাতেই

তার 'লু' লেগেছে। ভীষণ জ্বর। হারুবাবু ছেলের চিকিৎসার জন্যে ডাক্তার ডেকে এনেছেন।

ডাক্তার ছেলের নাড়ি টিপে দেখে বললেন—"এর 'লু' লেগেছে। মনে হচ্ছে, এ ছেলে বড় দুরন্ত। দুপুরের চড়া রোদে ঘরের বাইরে যাবার কী দরকার ছিল ? বোকার মতো কাজ হয়েছে। যে ছেলে বড়দের কথা শোনে না তাদের এই রকমই ভুগতে হয়।"

ডাক্তার উপদেশ দিচ্ছিলেন, আর মাঝে মাঝে ছেলেটিকে ধমক দিচ্ছিলেন। হারুবাবুর এ রকমটা ভালো লাগল না। তিনি বললেন— 'ডাক্তারবাবু ! আপনাকে ডেকে এনে খুব ভুল করেছি। আপনি আপনার ফি নিয়ে রেহাই দিন। আমার ছেলের চিকিৎসা আমি অন্য ডাক্তার ডেকে এনে করাব। আপনি তো আমার অসুস্থ ছেলেকে ধমকিয়ে আরও কষ্ট দিচ্ছেন।'

ডাক্তারবাবু খুব লজ্জিত হয়ে চলে গেলেন। যে কষ্টে পড়েছে তাকে সেই সময় তার ভুল দেখিয়ে, উপদেশ দিয়ে বেশি কষ্ট না দেওয়াই উচিত। তখন তো তাকে সহানুভূতি দেখানো আর তার সেবা করাই কর্তব্য।

——— ∘ ———

১৪ দুই টাট্টু

এক বণিকের দুটি টাট্টু ঘোড়া ছিল। সে তাদের পিঠে মালপত্র চাপিয়ে নিয়ে পাহাড়ের উপরে গ্রামে গ্রামে গিয়ে মাল বিক্রি করত। ওদের মধ্যে একটা ঘোড়ার কোনো এক অসুখ করেছিল। বণিক খেয়াল করেনি যে ওর একটা ঘোড়া অসুস্থ। বণিক যথারীতি গ্রামে বিক্রি করার জন্যে নুন, গুড়, ডাল, চাল ইত্যাদি সেদিনও দুটো ঘোড়ার পিঠেই সমান সমান চাপিয়ে নিয়ে রওনা দিল।

উঁচু-নিচু পাহাড়ি পথে চলতে অসুস্থ ঘোড়াটার খুব কষ্ট হচ্ছিল। সে তখন অপর ঘোড়াটিকে বলল—'ভাই! আজ আমার শরীরটা ভালো নেই। আমি আমার পিঠের একটা বস্তা এখানে ফেলে দিচ্ছি, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থাক। মালিক তাহলে ওই বস্তাটা তোমার পিঠে চাপিয়ে দেবে। আমার ভার কিছু কম হয়ে গেলে তোমার সঙ্গে চলতে পারব। তুমি আগে চলে গেলে বস্তাটা ফের আমার পিঠেই চাপিয়ে দেবে।'

দ্বিতীয় ঘোড়াটা বলল—'আমি তোমার বোঝা পিঠে নেবার জন্যে কেন দাঁড়াব ? আমার পিঠে কি কম বোঝা আছে ? আমি নিজের ভাগের বোঝাই বইব।'

অসুস্থ ঘোড়াটা চুপ করে গেল। কিন্তু চলতে চলতে ওর শরীর আরও খারাপ করছিল। কিছু দূরে গিয়েই একটা পাথরে ঠোক্কর খেয়ে

সে উল্টে পড়ে নিচের খাদে গড়িয়ে গেল, আর তাতেই সে মরে গেল।

বণিক তার একটা ঘোড়া মরে যাওয়ায় খুব দুঃখ পেল এবং এই অবস্থায় কী করা উচিত ভেবে নিল। তারপর সে ওই ঘোড়াটার পিঠে যত বোঝা ছিল সব দ্বিতীয় ঘোড়াটার পিঠে চাপিয়ে দিল। তখন তো ওই ঘোড়াটা খুব আপশোস করতে লাগল। মনে মনে ভাবতে লাগল—যদি আমি আমার সঙ্গীর কথা শুনে ওর একটা বস্তা নিতাম, তবে সব বোঝাগুলো আমাকে বইতে হত না।

বিপদের সময় নিজের সঙ্গীকে যে সাহায্য করে না তাকে পরে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়।

——— ॰ ———

ব্রহ্মার ঝুলি

এই জগতের যিনি সৃষ্টিকর্তা সেই ব্রহ্মা একবার মানুষকে নিজের কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—‘তোমরা কী চাও ?’

মানুষ বলল—‘প্রভু ! আমরা উন্নতি করতে চাই, সুখশান্তি চাই ; আর চাই সবাই আমাদের প্রশংসা করুক।’

ব্রহ্মা বললেন—‘ঠিক আছে।’ তারপর তিনি মানুষের সামনে দুটি ঝুলি দিয়ে বললেন—‘এই ঝুলি দুটি নাও। এগুলির মধ্যে একটি

ঝুলিতে তোমার প্রতিবেশীদের যত বদগুণ সব ভরা আছে। ওটি তোমার পিঠে ঝুলিয়ে নাও আর ওটাকে সর্বদা বন্ধ করে রাখবে। নিজেও দেখবে না, অপরকেও দেখাবে না। দ্বিতীয় ঝুলিটায় তোমার নিজের দোষগুলি ভরা আছে। ওটাকে সামনে ঝুলিয়ে নাও, আর বারবার খুলে খুলে দেখবে।'

মানুষ দুটো ঝুলিই তুলে নিল, কিন্তু একটু ভুল করে ফেলল। নিজের দোষের ঝুলিটা পিঠে ঝুলিয়ে তার মুখটা কষে বেঁধে দিল, আর প্রতিবেশীদের দোষে ভরা ঝুলিটা সামনে ঝুলিয়ে নিল। এই ঝুলিটার মুখটা খুলে রেখে সেটাকে বার বার দেখতে লাগল, আবার অপরকেও দেখাতে লাগল। এর ফলে সে যা চেয়েছিল তার উল্টো হয়ে গেল। দিন দিন তার অবনতি হতে লাগল। দুঃখ, অশান্তি বেড়ে গেল। সবাই তাকে খারাপ লোক বলতে লাগল।

তুমি এই ভুলটা যদি সংশোধন করে নাও তাহলে তোমার উন্নতি হবে। সুখশান্তি ও সমৃদ্ধি লাভ করবে। জগতে তোমার সুনাম হবে। তোমাকে করতে হবে কী নিজের প্রতিবেশীর বা পরিচিত জনের দোষ দেখা বন্ধ করতে হবে আর নিজের দোষের দিকে সর্বদা নজর রাখতে হবে।

—— • ——

সর্বোত্তম জয়

কোনো এক গ্রামে প্রতাপসিংহ নামে এক কৃষক বাস করত। প্রতাপসিংহ সিংহের মতোই ভয়ংকর আর দাম্ভিক ছিল। সে সামান্য কথায় রেগে গিয়ে মারামারি লাগিয়ে দিত। গাঁয়ের লোকের সঙ্গে কোনোদিন সোজাভাবে কথা বলত না। সে তো কারো ঘরে যেতই না, এমনকি কারো সঙ্গে রাস্তায় দেখা হলে তাচ্ছিল্যভাবে মুখ ঘুরিয়ে নিত। গ্রামের অন্যান্য চাষীরাও তাকে অহংকারী জেনে তার সঙ্গে কথা বলত না।

ওই গ্রামে দয়ারাম নামে একজন কৃষক অন্য গ্রাম থেকে এসে বসবাস করছিল। সে ছিল খুব সরল আর সৎ। সবার সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা বলত। সকলকে কোনো না কোনোভাবে সাহায্য করত। সব চাষীই তাকে খুব ভালোবাসত আর কাজেকর্মে তার পরামর্শ নিত।

গ্রামের কৃষকরা দয়ারামকে একদিন বলল—'ভাই দয়ারাম ! তুমি প্রতাপসিংহের বাড়ি কোনোদিন যেয়ো না, ওর থেকে দূরে থাকবে। ও ভীষণ ঝগড়াটে লোক।'

দয়ারাম হেসে বলল—'প্রতাপসিংহ আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে এলে ওকে আমি মেরে ফেলব।' এতে অপর কৃষকরা হেসে ফেলল। কারণ ওরা জানত যে দয়ারাম খুব দয়ালু। ও কাউকে মারা তো দূরের কথা কাউকে গালাগালি পর্যন্ত করতে পারে না। কিন্তু কথাটা একদিন

কেউ না কেউ প্রতাপসিংহের কানে তুলে দিয়েছিল। প্রতাপসিংহ তো রেগে আগুন। সে সেইদিন থেকে দয়ারামের সঙ্গে ঝগড়া করবার চেষ্টা করতে লাগল। সে একদিন দয়ারামের খেতে তার গোরুগুলো ছেড়ে দিল। গোরুগুলো খেতের অনেক ফসল খেয়ে ফেলল। কিন্তু দয়ারাম চুপচাপ তার খেত থেকে গোরুগুলোকে তাড়িয়ে দিল।

প্রতাপসিংহ দয়ারামের জমিতে জল যাবার নালা কেটে দিল আর যত জল বাইরে যেতে লাগল। দয়ারাম এসে চুপচাপ নালাটা আবার ঠিক করে বেঁধে দিল। এভাবে প্রতাপসিংহ সব সময় দয়ারামের ক্ষতি করতে থাকে। কিন্তু দয়ারাম একবারও তাকে ঝগড়া করার সুযোগ দিল না।

একদিন দয়ারামের এক আত্মীয় তাকে বনগাঁ থেকে অনেকগুলো তরমুজ পাঠিয়েছিল। দয়ারাম সব চাষীদের ঘরে একটা করে তরমুজ পাঠিয়ে দিল। কিন্তু প্রতাপসিংহ তরমুজ ফেরত দিয়ে বলে পাঠাল—'আমি এত ভিখারি নই। অপরের দান আমি নিই না।'

এরপর এল বর্ষাকাল। প্রতাপসিংহ একদিন একগাড়ি তরিতরকারি নিয়ে পাশের গ্রাম থেকে আসছিল। রাস্তায় নালার কাদায় তার গাড়িটা আটকে গেল। প্রতাপসিংহের বলদ দুটো ছিল খুব দুর্বল। তারা কিছুতেই কাদা থেকে গাড়িটা টেনে তুলতে পারল না। গ্রামে যখন এই খবর পৌঁছুল তখন সবাই বলল—'প্রতাপসিংহ ভীষণ বজ্জাত। সারারাত ওকে ওখানেই পড়ে থাকতে দাও।'

কিন্তু দয়ারাম নিজের শক্ত-সবল বলদ দুটো নিয়ে নালাটার দিকে চলল। লোকেরা তাকে যেতে নিষেধ করে বলল—'দয়ারাম ! প্রতাপসিংহ তোমার অনেক ক্ষতি করেছে। তুমি তো বলেছিলে

তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে এলে ওকে তুমি মেরে ফেলবে। আর আজ ফের তুমি ওকে সাহায্য করতে যাচ্ছ ?'

দয়ারাম বলল—'আজ আমি সত্যি সত্যি ওকে মেরে ফেলব। তোমরা সব দেখে যাও।'

যখন প্রতাপসিংহ দয়ারামকে বলদ নিয়ে আসতে দেখল তখন বড়াই করে বলে উঠল—'তোমার বলদ নিয়ে ফিরে যাও। আমি কারো সাহায্য চাই না।'

দয়ারাম বলল—'তোমার মন চায় তো গালাগালি কর, আমাকে মার। এ সময় তুমি বিপদে পড়েছ। তোমার গাড়ি আটকে গেছে, আর রাত হয়ে আসছে। এ সময় তোমার কথা আমি কিছুতেই শুনব না।'

দয়ারাম প্রতাপসিংহের বলদ দুটো খুলে নিজের বলদ দুটো গাড়িতে জুড়ে দিল। দয়ারামের শক্ত-সবল বলদ দুটো গাড়িটাকে টেনে নালা থেকে তুলে রাস্তায় এনে দিল। প্রতাপসিংহ গাড়ি নিয়ে বাড়ি ফিরল। তার দুষ্ট স্বভাব সেদিন থেকে বদলে গেল। ও বলে বেড়াতে লাগল—'দয়ারাম নিজের উপকার দিয়ে আমাকে মেরেই ফেলেছে। এখন আমি আর সেই আগেকার অহংকারী প্রতাপসিংহ নই।'

এখন সে সকলের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করে। মিষ্টি মুখে ভালোবেসে সকলের সঙ্গে কথা বলে।

অসৎকে সৎগুণের দ্বারা জয় করাই তো প্রকৃত জয়। দয়ারামই প্রকৃত শক্তিমান পুরুষ।

——— ∘ ———

১৭

মূর্খরাজ

বাদশাহ আকবর বীরবলকে খুব মান্য করতেন। বীরবল ছিলেন খুব বুদ্ধিমান এবং রসিক মানুষ। তিনি মজাদার কথা দিয়ে বাদশাহকে সর্বদা খুশি রাখতেন। আকবর আর বীরবলের মধ্যে বহু রসিকতার গল্প আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। সে সব গল্পের মধ্যে কিছু গল্প আছে যা খুবই শিক্ষামূলক। এমন একটা গল্প এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে—

বাদশাহ একদিন নিজের অন্দরমহলে গেছেন। বাদশাহের সবচেয়ে প্রিয়তমা বেগম সে সময় তাঁর কোনো সহচরীর সঙ্গে গল্প করছিলেন। বাদশাহ হঠাৎ গিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়ালেন। বেগমও উঠে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে বললেন—'আসুন মূর্খরাজ !' কথাটা শুনে বাদশাহের খুব খারাপ লাগল। তবে এর আগে বেগম কোনোদিন

বাদশাহকে এরকম অপমানকর কথা বলেননি। বাদশাহ্ জানতেন বেগম খুব বুদ্ধিমতী। তিনি বিনা কারণে এরকম কথা বলবেন না। কিন্তু বাদশাহ বুঝতে পারলেন না বেগম কেন তাকে আজ মূর্খরাজ বললেন। বেগমকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করাও তিনি ভালো মনে করলেন না। কিছুক্ষণ ওখানে থেকে তিনি নিজের দরবারে চলে এলেন।

বাদশাহ্ উদাস হয়ে বসে আছেন এমন সময় তাঁর কাছে বীরবল এসে হাজির হলেন। বীরবলকে দেখেই বাদশাহ বলে উঠলেন—'আসুন মূর্খরাজ!'

বীরবলও হাসতে হাসতে বললেন—'এই যে মূর্খরাজ মহারাজ!'

বাদশাহ চোখ পাকিয়ে বললেন—'বীরবল! তুমি আমাকে মূর্খরাজ কেন বললে?'

বীরবল বললেন—'জাঁহাপনা! মানুষ পাঁচ রকমের মূর্খ হয়। যদি দুজন লোক নির্জনে কথা বলতে থাকে আর সেখানে বিনা ডাকে বা না জানিয়ে কেউ গিয়ে দাঁড়ায় তো তাকে মূর্খ বলা যায়। দুজন লোকের মধ্যে কথাবার্তা বলা অবস্থায় যদি তৃতীয় ব্যক্তি তাদের মাঝে এসে তাদের কথা শেষ হওয়ার আগেই নিজে কথা বলতে থাকে তো তাকেও মূর্খ বলা যায়। যদি কেউ নিজের কোনো কথা বলে তো তার কথা সবটা না শুনেই যে কথা বলে, সেও মূর্খ। যে বিনা অপরাধে বা বিনা দোষে অপরকে গালাগালি দেয় আর দোষারোপ করে সেও মূর্খ। আর এই রকম মূর্খের কাছে যে যায় এবং তার সঙ্গ করে সেও মূর্খ।'

বাদশাহ্ বীরবলের কথায় খুব খুশি হলেন।

তোমরা এই কথাগুলি মনে রেখো। কোনোদিন এরকম ভুল তোমাদের যেন না হয় আর লোকেরা যেন তোমাদের মূর্খ না বলে।

— ◦ —

এস আর যাও

কোনো এক গাঁয়ে এক ধনবান ব্যক্তি বাস করত। তার নাম ছিল হারাধন। হারাধনের অনেক সম্পত্তি আর জমিজায়গা ছিল। তার চাকরবাকর, মুনিষ-মান্দার ছিল অনেক। লোকটি শক্তসমর্থ হলেও খুবই কুঁড়ে। সে কোনো দিন জমির ধারে-কাছে যেত না। চাকর এবং মুনিষ-মান্দারদের পাঠিয়ে দিয়েই সে তার সব কাজ সারত।

মুনিষ-মান্দাররাও নিজের খেয়ালখুশিমতো কাজ করত। তারা খেতের কাজ কিছুক্ষণ করে বাকি সময় ঘরে বসে, এধার-ওধার ঘোরাঘুরি করে কিংবা গল্প করে কাটিয়ে দিত। জমি ঠিকভাবে চষত না, ভালো করে সেচ দিত না, সার ঠিকমতো ছড়াত না, সময়মতো বীজ ফেলত না, আর জমি থেকে একটি ঘাসও কেউ নিড়াত না। ফলে এই দাঁড়াল যে ধীরে ধীরে জমি আগাছায় ভরে গেল। কিছুদিন পর হারাধনের আর্থিক অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ল।

ওই গাঁয়ে রামপ্রসাদ নামে আর একজন চাষী বাস করত। তার জমিজায়গা কিছু ছিল না। সে হারাধনের কাছ থেকে কিছু জমি নিয়ে ভাগে চাষ করত। কিন্তু রামপ্রসাদ ছিল খুব পরিশ্রমী। মুনিষদের সঙ্গে নিয়ে সে মাঠে যেত। দেখেশুনে তাদের খাটাত আর নিজেও খাটত। তার জমিতে ঠিকসময়ে সেচ দেওয়ায় চাষ-আবাদ ভালোভাবে হত। ভালো সার পড়ত, ঘাসগুলোও ঠিক ঠিক সময়ে নিড়ানো হত। সময়ে

বীজ ছড়ানো এবং বোনা দুইই হত। তার নিজের ঘরের লোকজনও মাঠে কাজ করত। রামপ্রসাদের জমিতে তাই ফসলও ভালো হত। মালিককে ভাগ দিয়ে, সংসারে খরচপাতি করেও সে তার থেকে অনেক ধান বাঁচাত। কিছুদিনের মধ্যেই রামপ্রসাদ গাঁয়ে একজন অবস্থাপন্ন লোক হয়ে উঠল।

এদিকে হারাধন খুবই গরিব হয়ে পড়েছে, তার ওপর মহাজনের ঋণ বাকি পড়েছে। বাধ্য হয়ে সে খানিকটা জমি বেচে দেওয়া মনস্থ করল। এই খবর পেয়ে রামপ্রসাদ ওর কাছে এসে বলল—'আমি শুনলাম আপনি জমি বিক্রি করতে চান। দয়া করে যদি জমিটা আমার কাছে বিক্রি করেন, খুব উপকার হয়। তবে আমি অন্যের থেকে কম দাম দেব না।'

হারাধন খুব অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল—'ভাই রামপ্রসাদ! আমার এত জমি ছিল তবু আমি ঋণগ্রস্ত হয়ে গেলাম, আর তুমি সাধারণ অবস্থা থেকে এত ধনী হলে কিভাবে? তুমি তো আমারই জমি নিয়ে চাষ-আবাদ করতে, জমির ভাগও তোমাকে দিতে হয় এবং সংসার চালাতেও হয়। আমার জমি কিনতে তোমাকে টাকা কে দিল?'

রামপ্রসাদ বলল—'আমাকে টাকা কেউ দেয়নি। টাকা তো আমি আমার জমির ফসল বাঁচিয়ে জমিয়েছি। আপনার চাষ-আবাদে আর আমার চাষ-আবাদে তফাৎ আছে। আপনি চাকর, মুনিষ-মান্দারদের কাজ করতে যাও, কাজ করতে যাও বলেন। এইজন্যে আপনার সম্পত্তিও চলে গেল। কিন্তু আমি মুনিষ আর চাকরদের আসার আগেই নিজে কাজের জন্যে তৈরি হয়ে ওদের সব সময় আমার সঙ্গে কাজ করতে আয় বলি। সেজন্যে আমার কাছে সম্পত্তি আসছে।'

এবার হারাধন সঠিক ব্যাপার বুঝতে পারল। সে সামান্য জমি
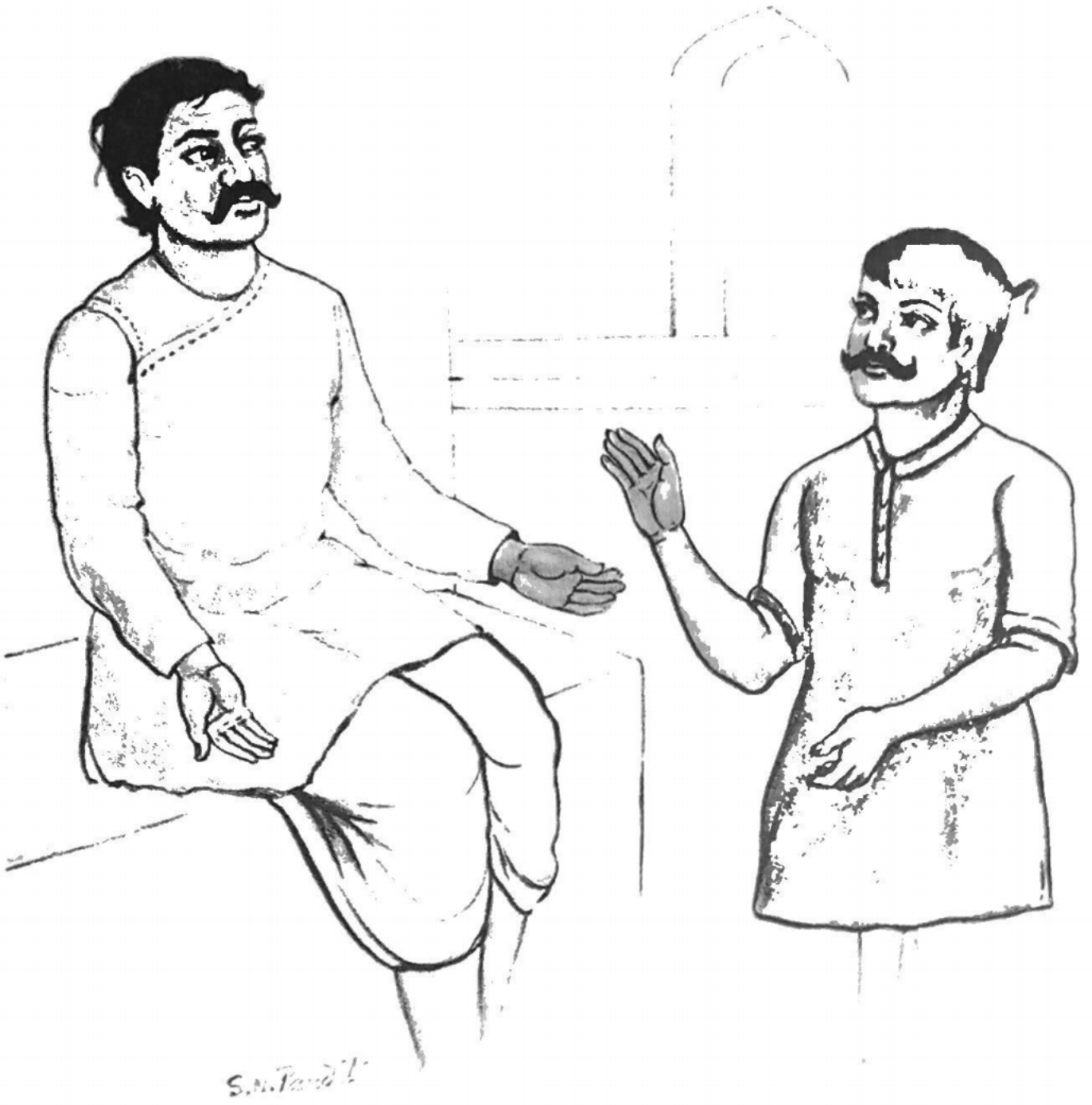
রামপ্রসাদকে বেচে ঋণ শোধ করল আর বাকি জমিতে নিজে পরিশ্রম করে চাষ-আবাদ করতে লাগল। কিছুদিনের মধ্যেই হারাধনের আর্থিক অবস্থা ফিরে গেল। আবার সে আগের মতো সুখী এবং অবস্থাসম্পন্ন হয়ে উঠল।

—— ◦ ——

খরগোশ আর ব্যাঙ

একবার কতকগুলো খরগোশ গরমের দিনে জঙ্গলের একটা শুকনো ঝোপের মধ্যে জড়ো হয়েছিল। জমিতে সেবার ধান হয়নি, তাই ওদের খাবারের অভাব দেখা দিয়েছিল। এছাড়াও সকাল-সন্ধ্যায় গাঁয়ের বাইরে যারা বেড়াতে বেরোত তাদের সঙ্গের কুকুরগুলো খরগোশদের খুব বিরক্ত করত। কুকুরগুলো পিছনে তাড়া করলে খরগোশগুলো খুব হয়রান হয়ে লুকোবার জায়গা খুঁজে পেত না। এই এত সব কষ্টে তারা খুব অসহায় হয়ে পড়েছিল।

একটা খরগোশ বলল—'ব্রহ্মা আমাদের খরগোশ জাতির প্রতি খুব অন্যায় করেছেন। আমাদের খুব ছোট আর দুর্বল করে সৃষ্টি করেছেন। আমাদেরকে উনি না দিয়েছেন হরিণের মতো শিং, না দিয়েছেন বিড়ালের মতো ধারালো নখ। শত্রুর হাত থেকে বাঁচবার আমাদের কোনো পথ নেই। সকলের কাছ থেকেই আমাদেরকে পালিয়ে বাঁচতে হয়। সৃষ্টিকর্তা সব দিক থেকে সমস্ত আপদ আমাদের মাথায় চাপিয়ে দিয়েছেন।'

অপর একটা খরগোশ বলল—'আমি তো এই দুঃখকষ্ট আর ভয়ে-ভরা জীবন নিয়ে খুব দুর্ভাবনায় পড়েছি। আমি জলে ডুবে মরব ঠিক করেছি।'

আর একটা খরগোশ বলল—'আমিও মরে যেতে চাই। এত দুঃখ আর সইতে পারছি না। আমি এখনই পুকুরে লাফিয়ে পড়ব।'

সব খরগোশ একসঙ্গে বলে উঠল—'আমরা সবাই তোমাদের

সঙ্গে যাব। আমরা সবাই যখন একসঙ্গে থাকি, একসঙ্গেই মরব।' সবাই তখন একসঙ্গে পুকুরের দিকে চলল।

পুকুরের জল থেকে উঠে এসে কিছু ব্যাঙ পুকুরের পাড়ে বসেছিল। যখন খরগোশদের আসার আওয়াজ পেল তখন ওরা ঝপাঝপ জলে লাফিয়ে পড়ল। ভয়ে ব্যাঙগুলোকে জলে লাফিয়ে পড়তে দেখে খরগোশগুলো দাঁড়িয়ে পড়ল। একটা খরগোশ বলল—'ভাইসব ! প্রাণত্যাগের দরকার নেই। এস ফিরে যাই। যখন ব্রহ্মার সৃষ্টিতে

আমাদের থেকেও ছোট, আমাদের থেকেও ভিতু জীব রয়েছে আর বেঁচেও রয়েছে, তখন আমরা কেন জীবনে নিরাশ হচ্ছি ?'

ওর কথা শুনে খরগোশরা আত্মহত্যার ইচ্ছা ত্যাগ করল আর সকলে ফিরে এল।

যখন তোমার ওপর কোনো বিপদ আসে আর তুমি খুব বিচলিত হয়ে পড় তখন চিন্তা করবে এই সংসারে তোমার চেয়েও কত দুঃখী, অভাবী, রুগ্ন আর বিপদগ্রস্ত প্রাণী রয়েছে। তুমি তাদের থেকে কত সুখে আছ। তাহলে তুমি কেন হতাশ হবে ?

——— ॰ ———

বাদশাহ ও মালী

পারস্য সম্রাট নাসের খাঁ তাঁর ন্যায়নিষ্ঠতার জন্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। দাতা হিসাবেও তাঁর নামডাক ছিল। একদিন তিনি তাঁর পাত্রমিত্রদের নিয়ে ভ্রমণে বেরিয়েছেন, দেখলেন একটা বাগানে একজন খুব বুড়ো মালী আখরোটের চারা লাগাচ্ছে। বাদশাহ

সেই বাগানে ঢুকলেন এবং মালীর কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—'তুমি কি এখানে মালীর কাজ কর, না বাগানটা তোমার নিজেরই?'

মালী—'আমি এখানে কাজ করি না। এ বাগান আমার নিজেরই, বাপ-ঠাকুরদারা লাগিয়েছেন।'

বাদশাহ—'তুমি যে এই আখরোটের চারা লাগাচ্ছ, তুমি কি মনে কর এই গাছে যখন আখরোট ফলবে তা খাবার জন্যে তুমি বেঁচে থাকবে?'

সবাই জানে আখরোটের চারা লাগানোর বিশ বছর পর এর ফল হয়। বুড়ো মালী বাদশাহের কথা শুনে বলল—'আমি আজ পর্যন্ত অপরের লাগানো গাছের বহু ফল খেয়েছি। সেজন্যে অপরের জন্য গাছ লাগানো আমারও তো উচিত। নিজে ফল খাবার জন্যে গাছ লাগানো তো স্বার্থপরতা।'

বাদশাহ মালীর উত্তর শুনে খুব খুশি হলেন। তাকে তিনি দুটি আশরফি বকশিশ দিলেন।

——— ∘ ———

২১ উপকারের বদলে প্রতি-উপকার

কোনো এক নদীর ধারে একটা গাছের ডালে একটি পায়রা আপন মনে বসেছিল। পায়রা গাছের ডালে বসে বসে দেখল একটা পিঁপড়ে নদীর স্রোতে ভেসে যাচ্ছে। বেচারা পিঁপড়ে বারবার চেষ্টা করছিল কিনারায় আসবার জন্যে কিন্তু প্রতিবারই স্রোতের টান তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। মনে হল পিঁপড়েটা কিছুক্ষণ পরেই জলে ডুবে মারা যাবে। পায়রার দয়া হল। সে তখন ঠোঁট দিয়ে একটা পাতা ছিঁড়ে পিঁপড়েটার সামনে নদীর জলে ফেলে দিল। পিঁপড়েটা পাতার উপর উঠে বসল। পাতাটা ভেসে ভেসে নদীর কিনারায় এসে ঠেকল। পিঁপড়ে তখন জল থেকে উঠে এসে পায়রার খুব প্রশংসা করতে লাগল।

ওই সময়ে এক ব্যাধ সেখানে এল আর পায়রাটাকে দেখে গাছের নিচে চুপচাপ বসল। পায়রা কিন্তু ব্যাধকে দেখতে পেল না। ব্যাধ তার পাখি মারা বাঁশের লগাটা পায়রাটাকে বিঁধে ফেলার জন্যে উপরের দিকে ধীরে ধীরে ওঠাতে লাগল। পিঁপড়েটা তাই দেখে গাছটার দিকে দৌড়তে লাগল। ও যদি কথা বলতে পারত তো চিৎকার করে পায়রাকে সাবধান করে দিত ; কিন্তু ও তো তা পারছে না। নিজের প্রাণরক্ষাকারী পায়রাটিকে বাঁচাবার জন্যে সে দৃঢ় সংকল্প করে
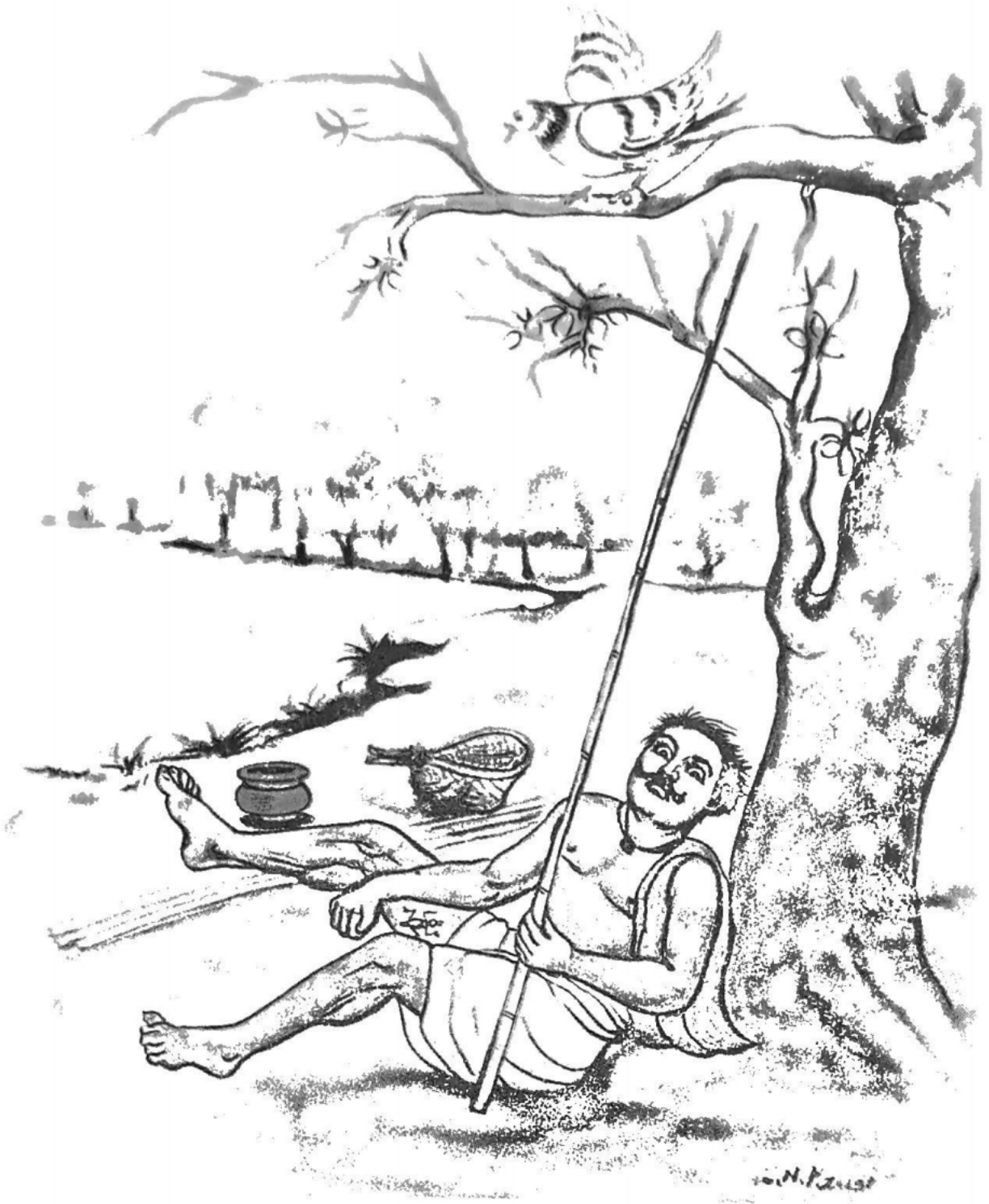
ফেলেছে। গাছের নীচে পৌঁছেই পিঁপড়ে ব্যাধের পায়ের উপরে উঠে গিয়ে জাং-এর ওপর গায়ের জোরে কামড়ে দিল।

পিঁপড়ের কামড়ের চোটে ব্যাধ যেমনি চমকে উঠেছে অমনি ওর লগাটা বেঁকে গেল। আর যেই না গাছের পাতাগুলো খড়খড় করে উঠেছে অমনি পায়রাটাও সতর্ক হয়ে উড়ে পালাল।

যে ব্যক্তি বিপদগ্রস্ত মানুষকে সাহায্য করে তার নিজের বিপদের সময়ও ভগবান অবশ্যই তাকে সাহায্যের ব্যবস্থা করেন।

——— ॰ ———

অতিথি সৎকার

এই কাহিনী একটি পুরাণ থেকে নেওয়া হয়েছে। এক ব্যাধ ছিল, সে বনে পাখি ধরে এনে বাজারে বিক্রি করত। সারাদিন বাঁশ নিয়ে সে বনে বনে ঘুরে বেড়াত আর পাখি ধরত। একবার শীতের দিনে ব্যাধ খুব সকালে পাখি ধরতে বনে গেল কিন্তু ওই দিন সে একটিও পাখি পেল না। এ-বন সে-বন ঘুরতে ঘুরতে তার সারাদিন কেটে গেল। ব্যাধ ঘুরতে ঘুরতে এতদূরে চলে গিয়েছিল যে সে দিন সে ঘরে ফিরে আসতে পারল না। অন্ধকার হয়ে এল। ও তখন একটা গাছের নীচে রাত কাটাবার মতলব করে বসে পড়ল।

সেদিন দিনের বেলায় বেশ বৃষ্টি হয়েছে ফলে রাত্রে কনকনানি শীত, বরফও পড়েছে খুব। ব্যাধের কাছে অতিরিক্ত কোনো কাপড় নেই। বনে রাত কাটাবে বলে তো সে ঘর থেকে বেরোয়নি। জোরে হাওয়া দিচ্ছিল। ব্যাধ থরথর করে কাঁপতে লাগল। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় তার দাঁতে দাঁত ঠেকে ঠকঠক করে আওয়াজ হচ্ছিল।

যে গাছটার নীচে ব্যাধ বসেছিল, ওই গাছটার উপরে এক জোড়া পায়রা খড়কুটো দিয়ে বাসা তৈরি করে বাস করত। ব্যাধের দুরবস্থা দেখে পায়রাটা তার স্ত্রীকে বলল—'যদিও এই লোকটা আমাদের চরমশত্রু, তবু আজ ও আমাদের এখানে অতিথি। এর সেবা করা আমাদের ধর্ম। এখন তো রাত হয়ে এল। ঠাণ্ডা আরও বাড়বে। যদি ও

ওই অবস্থায় থাকে তবে শীতের চোটে মরে যাবে। ওর মৃত্যুতে আমাদের পাপ হবে। এর ঠাণ্ডা দূর করার ব্যবস্থা করতে হবে।’

পায়রা দুটো তাদের ঘাসপাতার তৈরি বাসাটা নীচে ফেলে দিল। আর গাছের কিছু শুকনো ডাল ঠোঁট দিয়ে দাবিয়ে দাবিয়ে ভেঙে নীচে ফেলে দিল। আবার স্ত্রী পায়রাটা উড়ে গিয়ে দূর থেকে একটা জ্বলন্ত কাঠ ঠোঁটে করে এনে ওই শুকনো ঘাসপাতাগুলোর উপরে ফেলে দিল। শুকনো পাতাগুলো দাউদাউ করে জ্বলে উঠল। ব্যাধও আশপাশ থেকে আরও শুকনো কাঠি জোগাড় করে এনে আগুনে দিতে লাগল। ব্যাধের শীত কতকটা কমল।

এদিকে ব্যাধ তো সারাদিন কিছু খায়নি। সে আগুনের আলোয় এধার-ওধার চেয়ে দেখতে লাগল, যদি কিছু খাবার মেলে তো খেয়ে ক্ষুধা মেটাবে। ক্ষুধায় ওর মুখটা শুকিয়ে গিয়েছিল।

স্ত্রী পায়রাটা তার স্বামীকে বলল—‘অতিথি তো সাক্ষাৎ নারায়ণ-স্বরূপ। যার ঘর থেকে অতিথি ক্ষুধিত অবস্থায় ফিরে যায় তার সব পুণ্য ক্ষয় হয়ে যায়। এই ব্যাধ আজ আমাদের অতিথি আর ক্ষুধার্তও বটে। তার ক্ষুধা মেটাবার মতো আমাদের তো কিছুই নেই, আমি তাহলে ওই জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিচ্ছি যাতে আমার মাংস খেয়ে ওর পেট ভরে।’ স্ত্রী পায়রাটা এই বলে সঙ্গে সঙ্গে গাছ থেকে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পুরুষ পায়রাটা মনে মনে ভাবল—ওই অতটুকু মাংস দিয়ে এই অতিথির কী করে পেট ভরবে ! আমিও আগুনে ঝাঁপিয়ে আমার মাংসটাও ওকে খাওয়াব। এই ভেবে পুরুষ পায়রাটাও আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ওই সময় আকাশে দুন্দুভি বেজে উঠল, পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল। স্বর্গ

থেকে একটি রথ সেখানে নেমে এল, আর পায়রা দুটো স্বামী-স্ত্রীতে দেবতার মতো সুন্দর রূপ ধারণ করে ওই রথে চড়ে স্বর্গে চলে গেল। যেখানে তারা গেল, সেখানে মহা মহা যজ্ঞকারী রাজা, বড় বড় মুনি-ঋষিদেরও বহু কষ্ট করে পৌঁছতে হয়।

———— ॰ ————

সারস আর কৃষক

এক কৃষক পাখির জ্বালায় খুব অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। ওর জমিটা ছিল ঠিক জঙ্গলের পাশে আর জঙ্গলে ছিল পাল পাল পাখি। কৃষক যখনই বীজ ছড়িয়ে মই দিয়ে বাড়ি চলে আসত অমনি দলে দলে পাখি ওর জমিতে এসে বসত আর মাটি আঁচড়ে আঁচড়ে বীজগুলো খেয়ে নিত। কৃষক পাখি তাড়াতে তাড়াতে হয়রান হয়ে গিয়েছিল। ওর সব বীজ পাখিতে খেয়ে নিত। ফের আবার তাকে নতুন করে জমিতে চাষ দিয়ে বীজ বুনতে হত।

এবার কৃষক একটা বড় জাল নিয়ে এসে সারা জমিটায় বিছিয়ে দিল। অনেক পাখি জমিতে বীজ খেতে এসে আটকে গেল। একটা সারসও জালে আটকা পড়ল।

কৃষক যখন জালে আটকানো পাখিগুলোকে একে একে ধরতে লাগল তখন সারসটা বলে উঠল—'তুমি আমাকে দয়া কর। আমি তোমার কোনো ক্ষতি করিনি। আমি মুরগীও নই, হাঁসও নই, এমন কী বীজখেকো অন্য পাখিও নই। আমি সারস পাখি। জমিতে অনিষ্টকারী পোকাগুলো খেয়ে আমি ফসল রক্ষা করি। আমাকে তুমি ছেড়ে দাও।'

কৃষক রেগে খাপ্পা হয়ে ছিল। সে বলল—'তুমি ঠিক কথা বলেছ, কিন্তু আজ তুমি সেই পাখিদের সঙ্গে ধরা পড়েছ, যারা রোজ রোজ

আমার বীজ খেয়ে পালায়। তুমিও তাদের সঙ্গী। তুমি এদের সঙ্গে যখন এসেছ তখন তোমাকেও এদের সঙ্গে শাস্তি ভোগ করতে হবে।'

যে ব্যক্তি যেমন লোকের সঙ্গ করে তাকে সবাই সেই রকমই ভাবে। বদলোকের সঙ্গে থেকে খারাপ কাজ না করলেও শাস্তি এবং বদনাম পেতে হয়। অনিষ্টকারী পাখিদের সঙ্গ করার জন্য সারসকেও বন্দি হতে হল।

২৪ সারসের শিক্ষাদান

কোনো এক গ্রামের পাশে একজন কৃষকের কিছু আবাদি জমি ছিল। সেই জমিতে এক জোড়া সারস বাস করত। সেখানে তারা ডিম পেড়েছিল। ডিমগুলো পুষ্ট হয়ে যথাসময়ে একদিন বাচ্চা বেরিয়ে এল। কিন্তু বাচ্চাগুলো বড় হয়ে ওড়বার আগেই মাঠের ফসল পেকে গেল। সারসরা খুব চিন্তায় পড়ল। কৃষক ধান কাটতে আসবে, তার আগেই বাচ্চা নিয়ে ওদের ওখান থেকে চলে যেতে হবে কিন্তু বাচ্চারা এখনও উড়তে শেখেনি। সারসী তার বাচ্চাদের বলল—'আমাদের অনুপস্থিতিতে কেউ যদি মাঠের কাছে আসে তবে ওদের কথাবার্তা শুনে মনে রাখবি।'

একদিন যখন সন্ধ্যাবেলা খাদ্য নিয়ে সারসী বাচ্চাদের কাছে ফিরে এল তখন বাচ্চারা বলল—'মা! আজ কৃষক এসেছিল। সে আলের চারদিকে ঘুরছিল। সারা জমিটা অনেকক্ষণ ঘুরে ঘুরে দেখল। ও বলছিল, ধান এখন কাটার মতো হয়েছে। আজ গাঁয়ে গিয়ে লোকজনদের বলি যে ওরা যেন আমার ধানগুলো কেটে দেয়।'

সারসী বলল—'তোরা ভয় পাস না। ধান এখন কাটবে না। এখনও ধান কাটার দেরি আছে।'

কয়েকদিন পর, আর একদিন সন্ধেয় যখন সারসী বাচ্চাদের কাছে ফিরে এল তখন বাচ্চাগুলো খুব ভয় পেয়ে গেছে। ওরা বলল—'মা এখন আমাদেরকে তাড়াতাড়ি এই জমি ছেড়ে দিতে হবে। আজ কৃষক

ফের এসেছিল। ও বলছিল, গাঁয়ের লোক খুব স্বার্থপর। ওরা আমার ফসল কাটার কোনো ব্যবস্থা করবে না। কাল আমার ভাইদের পাঠিয়ে ধানটা কাটিয়ে নেব।'

সারসী বাচ্চাদের পাশে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে বলল—'এখন ও ধান কাটবে না। দু-চারদিন পর তোরা ভালোভাবে উড়তে পারবি। এখন

ভয় পাবার কিছু নেই।'

আরও কয়েকদিন কাটল। সারসের বাচ্চাগুলো উড়তে শিখে গেল আর তাদের ভয়ও দূর হয়ে গেল। একদিন সন্ধেবেলায় তারা সারসীকে বলতে লাগল—'এই কৃষক আমাদের মিছিমিছি ভয়

দেখাচ্ছে। ও ধান তো কাটবে না। ও আজও এসেছিল, আর বলছিল, আমার ভাইরা কথা শুনছে না। সবাই অজুহাত দেখাচ্ছে, আর আমার ধান শুকিয়ে ঝরে যাচ্ছে। কাল খুব সকাল বেলাতেই আমি নিজে এসে ধান কাটব।'

সারসী ভয় পেয়ে বলল—'চল তাড়াতাড়ি কর। এখনও অন্ধকার নামেনি। অন্য জায়গায় উড়ে চল। কাল নিশ্চয় ধান কাটা হবে।'

বাচ্চারা বলল—'কেন ? এবার ধান কাটা হবে কি করে বুঝলে ?'

সারসী বলল—'কৃষক যতদিন গাঁয়ের লোক আর ভাইদের ভরসায় ছিল ততদিন ধান কাটার কোনো আশাই ছিল না। যে অপরের ভরসায় কাজ ছেড়ে দেয় তার কাজ হয় না। তবে যে নিজে কাজ করার জন্য তৈরি হয়, তার কাজ আটকায় না। কৃষক যখন নিজে কাল ফসল কাটবে বলেছে তখন তো সে অবশ্যই ধান কাটবে।'

বাচ্চাদের নিয়ে সারসরা তখনই ওখান থেকে উড়ে অন্য জায়গায় চলে গেল।

— • —

উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা

একবার এক সিংহের পায়ে বড় একটা কাঁটা ফুটে গিয়েছিল। সিংহ দাঁত দিয়ে অনেক খোঁচাখুঁচি করেছিল কিন্তু কাঁটাটা টেনে তুলতে পারেনি। সে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এক মেষপালকের কাছে গেল। মেষপালক তার কাছে সিংহকে আসতে দেখে খুব ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু ও বুঝতে পারল যে পালাতে চাইলে সিংহ দু-লাফে তাকে ধরে ফেলবে। কাছে কোনো গাছও ছিল না যে তার ওপর চড়ে বসবে। অন্য কোনো উপায় না দেখে মেষপালক সেখানেই চুপচাপ বসে রইল।

সিংহ কোনো তর্জনগর্জন করল না। সে মেষপালকের সামনে এসে বসে নিজের পা-টা তার দিকে এগিয়ে দিল। মেষপালক বুঝতে পারল সিংহ তার কাছে সাহায্য চাইছে। সে সিংহের পা থেকে কাঁটাটা তুলে দিল। তখন সিংহটা যেমন এসেছিল তেমনি জঙ্গলের দিকে চলে গেল।

কিছুদিন পর রাজবাড়িতে চুরি হয়ে গেল। কিছু লোক শত্রুতা করে মিছিমিছি রাজাকে সংবাদ দিল যে মেষপালক একজন চোর আর সেই রাজবাড়িতে চুরি করেছে। মেষপালককে ধরে আনা হল। কিন্তু তার ঘর থেকে চুরি করা কোনো জিনিস পাওয়া গেল না। রাজা মনে করলেন, এ নিশ্চয় চুরির মাল কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। তাই তিনি মেষপালককে জীবন্ত সিংহের সামনে ছেড়ে দেবার হুকুম দিলেন।

দৈবযোগে মেষপালককে মারবার জন্যে সেই সিংহটাকেই ধরে আনা হল, যার পায়ের কাঁটা মেষপালক তুলে দিয়েছিল। যখন মেষপালককে সিংহটার সামনে ছেড়ে দেওয়া হল, সিংহটা তাকে চিনতে পারল। সিংহ তখন মেষপালকের সামনে এসে বসে পড়ল আর কুকুরের মতো লেজ নাড়তে লাগল।

রাজা খুব অবাক হয়ে গেলেন। জিজ্ঞাসা করে যখন উপকারী মেষপালকের প্রতি সিংহের কৃতজ্ঞতার কথা জানলেন তখন তিনি মেষপালককে ছেড়ে দিলেন।

সিংহের মতো ভয়ংকর পশুও নিজের প্রতি উপকারীর উপকার ভোলে না। মানুষ হয়ে যে উপকারীর উপকার ভুলে যায় সে তো পশুরও অধম।

——— ০ ———

ধূর্ত গাধা

বনের ভিতর দারুণ ধূর্ত থাকত এক গাধা।
মনের সুখে চরত বনে কেউ দিত না বাধা॥
একদিন সে চরতে চরতে বনের ধারে এল।
ঘাসের উপর সিংহের এক চামড়া খুঁজে পেল।
আনন্দেতে চামড়াখানা সারা গায়ে ঢেকে।
সিংহ সেজে সন্ধেবেলায় যায় সে গাঁয়ের দিকে॥
সিংহ দেখে গাঁয়ের মানুষ পালায় যখন ছুটে।
মনের সুখে খেতের ফসল খায় সে লুটেপুটে॥
খেতের ফসল নিত্য খেয়ে হল মোটা তাজা।
ভাবল বুঝি এবারে সে হল বনের রাজা॥
চোখ রাঙিয়ে বলত গাধা অন্য পশু সবে।
তোরা আমার খাসের প্রজা, সেলাম করতে হবে॥
একদিনকে চাঁদনি রাতে খুশিতে প্রাণভরে।
খেতের যত ফসল ছিল নিল পেটে পুরে॥
সিংহ দেখে রাত পাহারার যত রাখাল ছিল।
ভয়ের চোটে দিগ্‌বিদিকে সবাই দৌড় দিল॥
হঠাৎ গাঁয়ের ভিতরে এক গাধায় ধরল গান।
তাই না শুনে সিংহমামা করল উঁচু কান॥

ধরল গাধা ভরা পেটে মধ্য রাতের রাগ।
বুঝল যত রাখাল ছেলে নয়কো এতো বাঘ।।
লাঠিসোঁটা নিয়ে তারা মাঠের পানে ধায়।
গানের রাজা গাধামশায় তখনও গান গায়।।
ধপাস্ ধপাস্ পড়ল লাঠি মূর্খ গাধার পিঠে।
কাতরানিতে গেল গাধার গানের আমেজ ছুটে।।
এমনি করে ধোঁকা দিয়ে যারাই চলতে চায়।
গাধার মতো করুণ দশাই তাদের প্রাপ্তি হয়।।

—— ∘ ——

লোভী বাঁদর

একটা বাঁদর এক গৃহস্থের বাড়িতে প্রত্যেকদিন আসত আর খুব উৎপাত করত। কোনোদিন কাপড় ছিঁড়ে দিত, কোনোদিন ভাতের হাঁড়ি নিয়ে পালাত আবার কোনোদিন বাচ্চা ছেলেদের আঁচড়ে কামড়ে দিত। ও যদি খাবার জিনিস নিয়ে যেত তো গৃহস্থের অত দুঃখ হত না কিন্তু ওর ক্ষতিকর স্বভাবের জন্যে সকলে খুব অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল।

একদিন বাড়ির মালিক বলল—'এই বাঁদরটাকে ধরে বাইরে চালান করে দেব।' ভদ্রলোক একটা ছোট মুখওয়ালা হাঁড়ি নিয়ে এল। তারপর সেটার ভিতরে কিছু ছোলা দিয়ে মাটিতে পুঁতে দিল কেবল হাঁড়ির মুখটা খোলা রাখল। তারপর সবাই সেখান থেকে দূরে সরে গেল।

বাঁদরটা উঠোনে ঢুকে কিছুক্ষণ এধার-ওধার লাফালাফি করার পর মাটিতে পোঁতা হাঁড়িটার ভিতরে ছোলাগুলো দেখতে পেল। এবার হাঁড়ির পাশে বসে ছোলা বার করার জন্যে হাঁড়িতে হাত ঢুকিয়ে দিল। তারপর ছোলাগুলো মুঠো করে ধরল যাতে বার করে এনে খেতে পারে। হাঁড়িটার মুখটা ছিল খুব সরু তাই ওটার ভিতর থেকে মুঠো করা হাত ও কিছুতেই বের করতে পারছিল না। হাত বের করার জন্যে সে আপ্রাণ টানাটানি করতে লাগল আর লাফাতে লাগল। কিন্তু ছোলা ভর্তি মুঠোও লোভে ছাড়তে পারছিল না। শেষে সে খুব চিৎকার

করতে আরম্ভ করল। কিন্তু কোনোই ফল হল না।

ভদ্রলোক এসে দড়ি দিয়ে বেশ করে বাঁদরটাকে বেঁধে ফেলল আর বাইরে চালান করে দিল। ছোলার লোভে বাঁদরটা ধরা পড়ে গেল।
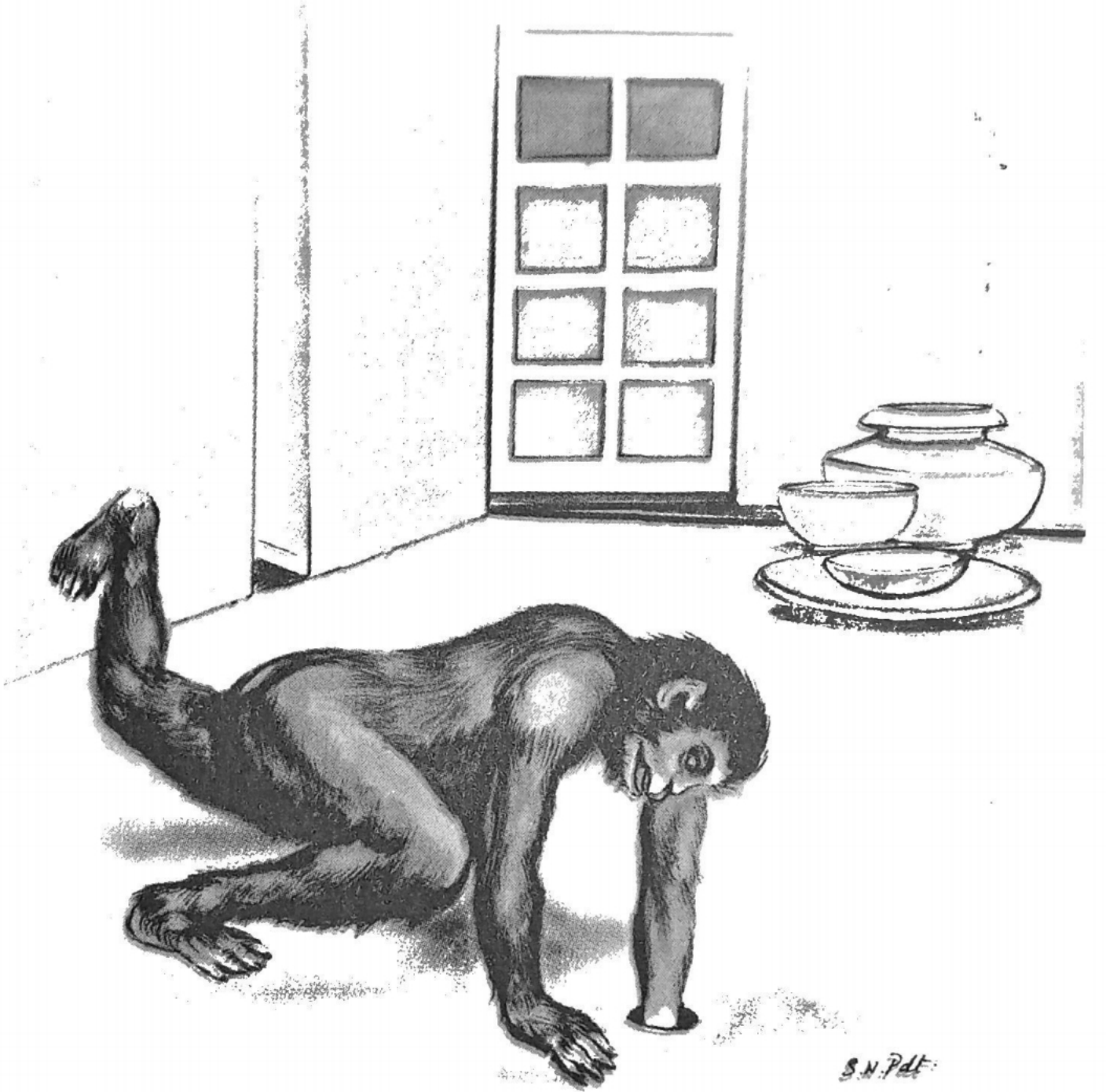
এজন্যে বলে—**'লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু'**।

—— • ——

লোভী কুকুর

একটা কুকুর মুখে একটুকরো রুটি নিয়ে নালার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। নালায় জল ছিল, কিন্তু সেটি খুব গভীর নয়। তাই কুকুরটা জলের উপর দিয়েই নালাটা পেরিয়ে যাবে ভাবল। জলে নেমেই ও নিজের ছায়াটা জলের মধ্যে দেখতে পেল।
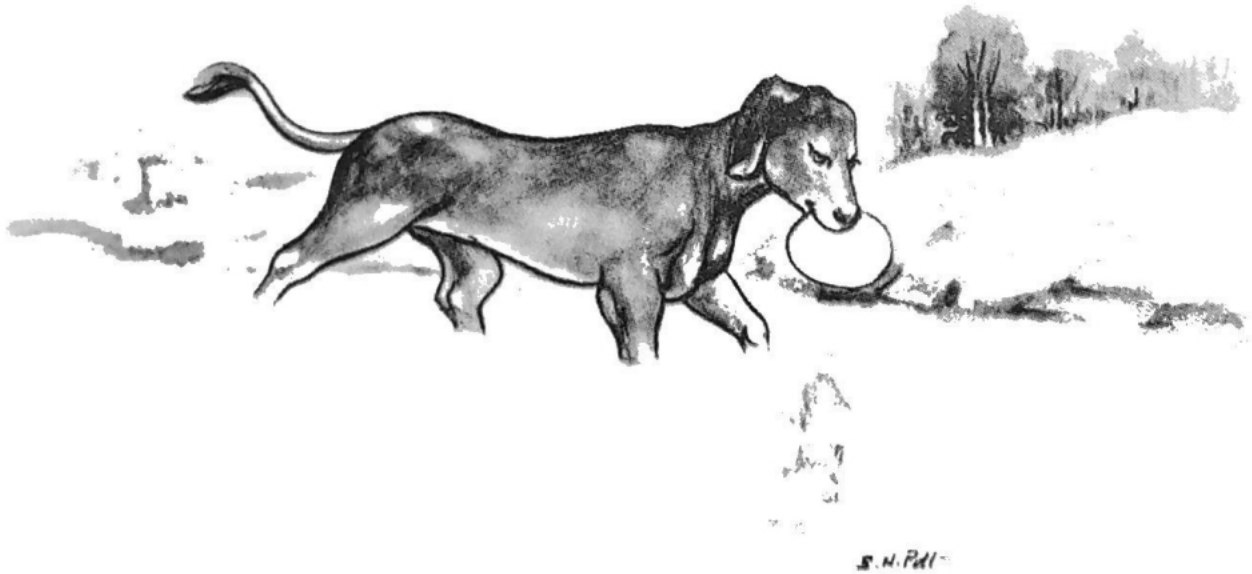
কুকুরটা মনে করল, জলের ভিতরে বোধ হয় আর একটা কুকুর রুটি নিয়ে যাচ্ছে। যদি ওর রুটিটাও নিতে পারে তবে ওর দুটো রুটি হয়ে যাবে। এই না ভেবে যেই কুকুরটা ছায়া-কুকুরটার রুটিটা কেড়ে নেবার জন্যে হাঁ করেছে অমনি ওর মুখের রুটিটা জলে পড়ে ভেসে গেল। আর ছায়া-কুকুরটার মুখেও সেটা আর দেখা গেল না।

সে পুরোটা পেতে গিয়ে নিজেরটাও হারাল।

আধা ছেড়ে পুরো চায়। শেষমেষ সব যায়॥

বাঁদরের বিচার

এক গাঁয়ে থাকত দুটো বিড়াল। দুজনে বেশ মিলেমিশে বাস করত। তারা একজন যদি কিছু খাবার পেত তো দুজনে ভাগ করে খেত। একদিন ওরা একটা রুটি চুরি করে আনল। রুটিটা অর্ধেক অর্ধেক ভাগ করার পর দুজনের মধ্যে খুব ঝগড়া লেগে গেল। একজন বলল, তোর দিকটা বড় আমার দিকটা ছোট। আর একজন বলল, তোর রুটিটা বড় আমার রুটিটা ছোট।

যখন নিজেদের মধ্যে আপোসে ভাগ করা গেল না তখন তারা রুটিটা নিয়ে একটা বাঁদরের কাছে গেল। বাঁদরকে তারা বিচারক

নিযুক্ত করল। বাঁদর তখন একটা দাঁড়িপাল্লা আনিয়ে রুটির টুকরো দুটো পাল্লার দুদিকে চাপাল। ওজন করার সময় যে-টুকরোটা একটু ভারী সেই টুকরোটা থেকে খানিকটা কামড়িয়ে খেয়ে ফেলল। আবার অন্য টুকরোটা যখন ভারী হল তখনও ঠিক একইভাবে সেটা থেকে কিছুটা কামড়ে খেয়ে নিল। এভাবে বারবার ওজন করতে করতে প্রত্যেকবার ভারী দিকটা থেকে ও কিছুটা অংশ খেয়ে নিচ্ছিল।

এইভাবে যখন বাঁদরটা রুটির অনেকগুলো টুকরো খেয়ে নিল আর দাঁড়িপাল্লার রুটি ক্রমশ ছোট হয়ে গেল, তখন বিড়াল দুটো চিন্তায় পড়ল। ওরা বলল—'ভাই ! আর তোমাকে কষ্ট করতে হবে না, আমরা নিজেরাই আপোশে ভাগ করে নেব।' বাঁদর বলল—'বাঃ বাঃ, আমি এত পরিশ্রম করলাম, আমাকে তো কিছু পারিশ্রমিক দেবে ?' এই বলে সে দুটো টুকরোই মুখে পুরে দিয়ে 'হুম্ হুম্' করে বিড়াল দুটোকে ভয় দেখাতে দেখাতে পালিয়ে গেল। বিড়াল দুটো তখন আপশোস করে বলতে লাগল—'পরস্পর অবিশ্বাস খুব অনিষ্টকর।'

——— ◦ ———

শের চিতা লড়ে যায়, শিয়াল ভায়া হরিণ খায়

কোনো এক জঙ্গলে একটা বাঘ আর একটা চিতা বাস করত। এমনিতে তো বাঘ খুব শক্তিশালী কিন্তু সেই বাঘটা খুব বুড়ো হয়ে গিয়েছিল। বেশি দৌড়তে পারত না। চিতাটা যেমন মোটা ছিল তেমনি শক্তিশালীও ছিল। তা সত্ত্বেও চিতাটা বুড়ো বাঘটাকে খুব ভয় পেত। সে জন্য তার সঙ্গে ভাব রেখে চলত কারণ বুড়ো হলেও বাঘ চিতার চেয়ে কিছু বেশি শক্তিশালী বটে।

একবার কিছুদিন ধরে বাঘ বা চিতা কারোরই শিকার জোটেনি। দুজনেই অনাহারে দিন কাটাচ্ছিল। ওরা একদিন দেখল একটা বাচ্চা হরিণ তাদের কাছাকাছি চরছে। চিতাটা বাঘকে বলল—'আমি হরিণটা ধরছি, তুমি ওই নালাটার ওপর বসে থাক, যাতে হরিণটা নালায় নেমে লুকিয়ে না পড়ে।'

বাঘ নালার ওপর বসল আর চিতা দৌড়ে গিয়ে হরিণটাকে ধরে মেরে ফেলল। কিন্তু হরিণটা ছিল খুব ছোট। তা দিয়ে বড় জোর একজনের পেট ভরতে পারে। দুজনেই ক্ষুধার্ত, কাজেই দুজনের মনেই খাবার লোভ। চিতা বলল—'হরিণটাকে আমি একলাই মেরেছি, তাই আমিই খাব।'

বাঘ বলল—'বাঃ বাঃ, আমি হলাম বনের রাজা, হরিণটা আমিই

খাব। তুমি তো দৌড়তে পার। দৌড়ে আর একটা শিকার করে নাও।'

দুইজনের মধ্যে ঝগড়া বাড়তে লাগল। একসময় তারা পরস্পর দাঁত আর নখ দিয়ে লড়াই করতে লেগে গেল। ঝোপের আড়াল থেকে লুকিয়ে একটা শিয়াল এসব ব্যাপার দেখছিল। যখন বাঘ আর চিতা একজন আর একজনকে দাঁত আর নখ দিয়ে বেশ ভালোরকম কাবু

করে দিয়েছে ; তারা মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে, ঠিক তখন শিয়াল ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে হরিণটাকে দাঁত দিয়ে চেপে ধরে ঘসটাতে ঘসটাতে ঝোপের মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে খেতে লাগল। বাঘ বা চিতা কেউই তখন উঠে দাঁড়াতে পারছিল না। তারা চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল।

যখন দুজন লোক কোনো ব্যাপার নিয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি করে তাতে দুজনেরই ক্ষতি হয় আর তৃতীয় ব্যক্তি লাভবান হয়। এজন্যে পরস্পর মারামারি করা উচিত নয়। যদি কিছু ক্ষতি হয় তো সহ্য করে নিয়ে মিলেমিশে থাকতে হয়।

——— ∘ ———

মিথ্যা কথার ফল

একটা রাখাল রোজ মাঠে ভেড়া চরাতে যেত। সে ছিল খুব বদমাশ। ওর পেটে পেটে দুষ্ট বুদ্ধি খুব। ও ভেড়া চরাতে মাঠে যেত, আর মিছিমিছি চিৎকার করত—'নেকড়ে, নেকড়ে, ভেড়ার পালে নেকড়ে পড়েছে, তোমরা সব দৌড়ে এস।' এই চিৎকার শুনে যখন গাঁয়ের লোকেরা দৌড়ে সেখানে যেত তখন সে মজা পেয়ে দাঁত বার করে হাসত।

একদিন হয়েছে কী, রাখাল ভেড়া চরাতে চরাতে জঙ্গলের কাছাকাছি চলে গিয়েছে, আর সত্যি সত্যিই একটা নেকড়ে ভেড়ার পালে ঢুকে পড়েছে। রাখালটাও খুব চিৎকার করছে—'নেকড়ে, নেকড়ে, তোমরা ছুটে এস।' কিন্তু লোকে জানত ও বদমায়েশি করে মিছিমিছি চিৎকার করছে, তাই সেদিন কেউ আর গেল না। নেকড়েটা একটা ভেড়াকে তুলে নিয়ে চলে গেল। রাখাল তখন খুব পস্তাতে লাগল।

যে মিথ্যা কথা বলে তাকে লোকে বিশ্বাস করে না, ভালোও বাসে না। আর এই বিশ্বাস হারিয়ে তাকে সারা জীবন নানা কষ্ট পেতে হয়।

—— • ——

অহংকারই পতনের কারণ

তোমরা খরগোশ দেখেছ। খরগোশ সাধারণত ছাই ছাই এবং সাদা রঙের হয়। এছাড়া অন্য রঙের খরগোশও দেখা যায়। কিছুলোক আবার খরগোশ পোষেও। সংস্কৃত ভাষায় খরগোশকে শশক বলে। খরগোশ খুব ছোট জন্তু হলেও খুব জোরে দৌড়তে পারে।

একবার এক খরগোশ খুব গর্ব করে বলছিল—'আমি খুব জোরে দৌড়তে পারি, পৃথিবীতে আর কেউ আমার মতো এত জোরে দৌড়তে পারে না।' পাশেই একটা কচ্ছপ শুয়েছিল। সে বলল—'তুমি খুব জোরে দৌড়তে পার, কথাটা ঠিক, কিন্তু কোনো কিছুর গর্ব না করাই ভালো। অহংকার করলে পরে লজ্জা পেতে হয়।' খরগোশ বলল—'আমি মিথ্যা বড়াই করি না। নিজের সত্যি গুণের কথা বললে দোষ কী ? তুমি তো পোকার মতো বুকে হেঁটে চল, তাই আমার গুণের কথা শুনে তোমার জ্বালা ধরছে।'

যখন খরগোশ কচ্ছপকে খুব রাগাতে লাগল তখন কচ্ছপ বলল—'তোমার নিজের চলনের যদি এত অহংকার, তো এস না একদিন তোমার আমার দৌড়ের বাজি হয়ে যাক। দেখি কে জেতে আর কে হারে !'

খরগোশ বলল—'ঠিক আছে, তাই হোক, এখনই হয়ে যাক।'

খরগোশ অনেক দূরে একটা গাছ দেখিয়ে বলল—'ঠিক আছে !

চল, ওই গাছের কাছে যে আগে যেতে পারবে তারই জিত মেনে নেওয়া হবে।’

খরগোশ ভাবল, বেচারা কচ্ছপ তো পোকার মতো চলবে, তাই ও যখন গাছের থেকে চার হাত দূরে থাকবে তখন আমি দৌড়তে আরম্ভ করব। হাঁটতে হাঁটতে গেলেও ওর থেকে আগে পৌঁছব।

সে কচ্ছপকে বলল—‘তুমি তো ক্ষুদ্র জীব, আস্তে আস্তে চলবে, এখনই চলতে আরম্ভ কর। আমি একটু পরে যাচ্ছি।’

কচ্ছপ বলল—‘দৌড়ের আরম্ভ তো এখন থেকেই ধরা হবে ? তোমার যখন খুশি দৌড় আরম্ভ করতে পার।’

খরগোশ কচ্ছপের কথা মেনে নিল। কচ্ছপ বুকে হেঁটে পোকার মতো চলতে আরম্ভ করল। খরগোশ ভাবল এর তো গাছের কাছে পৌঁছতে অনেক দেরি হবে, ততক্ষণ আমি একটু আরাম করে নিই। ও ওখানে শুয়ে পড়ল, আর তার ঘুম পেয়ে গেল। সে কতক্ষণ শুয়ে ঘুমোচ্ছে বুঝতে পারল না। যখন ঘুম ভাঙল তখন দেখে কচ্ছপ অনেক আগেই গাছের কাছে পৌঁছে গেছে। খরগোশ খুব লজ্জিত হয়ে গেল। ও তখন স্বীকার করল যে সত্যিই গর্ব করা ভালো নয়।

অহংকারীর মাথা উঁচু থাকে না। যে ব্যক্তি বড়াই করে আর কাজকে তুচ্ছ জ্ঞান করে সে কোনো দিন সফল হয় না। সাফল্য আর সম্মান সেই পায় যে ধৈর্য ধরে কাজে লেগে থাকে।

— • —

ভুলের পরিণাম

একটা লোভী কুকুর ছিল। পাখিদের ডিম খেয়ে বেড়ানো তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। সে খেতের আলে আলে আর নদীর ধারে ধারে ঘুরে বেড়াত আর তিতির পাখির ডিম দেখলেই খেয়ে ফেলত।
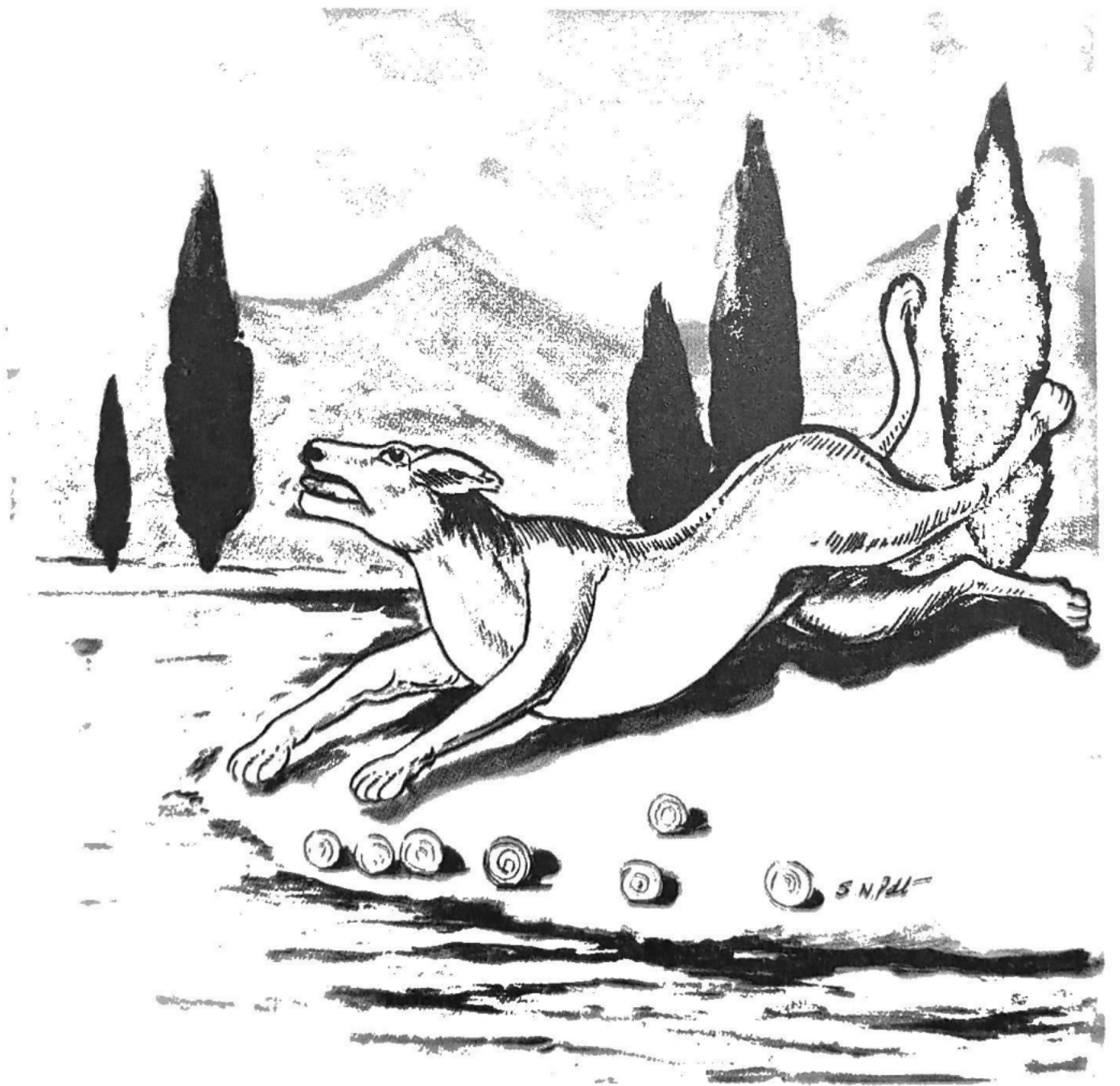
সে একদিন নদীর ধারে পাখিদের ডিম খুঁজে বেড়াচ্ছিল, হঠাৎ তার চোখে পড়ল ডিমের মতো একটা গোল জিনিস। ওটাকে সে একটা ডিম মনে করে তাড়াতাড়ি গিলে ফেলল। আসলে ওটা ছিল একটা শামুকের খোলা। গিয়ে ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই শামুক-ভাঙা খোলা তার পেটে গিয়ে নাড়িতে গেঁথে গেল। বেচারা যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল। তখন সে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল—'আমার খুব ভুল হয়ে গেছে। এখন আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি সব গোল জিনিসমাত্রই ডিম নয়।'

যে অবুঝ ছেলে না জেনেশুনে কোনো জিনিস খেয়ে নেয় তারও এই রকম দশা হয়। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত না জানা যাচ্ছে যে কোন জিনিস খাবার উপযুক্ত আর কোন জিনিস খাবার উপযুক্ত নয় ততক্ষণ তা মুখে দিতে নেই।

— • —

সত্যবাদী হরিণ

পুরাণে একটি সুন্দর কাহিনী আছে। জঙ্গলের মধ্যে ছিল এক দিঘি। ওই জঙ্গলের যত জন্তু ছিল সব এসে ওই দিঘিতে জল খেত। একদিন এক শিকারিকে ওই দিঘির ধারে দেখা গেল। সে দিঘিতে হাত-মুখ ধুয়ে জল খেয়ে দিঘির পাড়ে বসল। শিকারি খুব ক্লান্ত আর কয়েকদিন অনাহারে ছিল। সে ভাবল—জঙ্গলের জন্তু-জানোয়ার নিশ্চয় এইখানে জল খেতে আসে ; তাহলে এখানেই আমি শিকার পেয়ে যাব। সে তখন দিঘির পাড়ে একটা বেলগাছে চড়ে বসে রইল।

কিছুক্ষণ পর এক হরিণী ওই দিঘিতে জল খেতে এল। শিকারি হরিণীকে মারবার জন্যে ধনুকে তীর জুড়ল। হরিণী শিকারিকে ধনুকে তীর জুড়তে দেখে বলল—'ভাই শিকারি ! আমি জানি এখন পালিয়ে গিয়েও তোমার তীরের হাত থেকে আমি রেহাই পাব না, কিন্তু তুমি আমার ওপর দয়া কর। আমার দুটো ছোট ছোট বাচ্চা আমার পথ চেয়ে বসে আছে। তুমি আমাকে কিছুক্ষণের জন্য ছেড়ে দাও। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, বাচ্চাদের দুধ খাইয়ে আর আমার বান্ধবীর হাতে ওদের সঁপে দিয়ে আমি তোমার কাছে ফিরে আসব।'

শিকারি হাসল। ওর বিশ্বাস হল না যে, হরিণী প্রাণ দিতে আবার ওর কাছে ফিরে আসবে। যাইহোক সে মনে মনে ভাবল—ও যখন এত করে বলছে তখন ওকে ছেড়ে দেওয়াই উচিত। আমার ভাগ্যে যদি থাকে তবে আর একটা শিকার পেয়ে যাব। সে হরিণীকে ছেড়ে দিল।

কিছুক্ষণ পর সেখানে বড় বড় শিং ওয়ালা একটা সুন্দর কালো রঙের হরিণ জল খেতে এল। শিকারি যখন তাকে মারবার জন্যে ধনুকে তীর জুড়ল তখন হরিণটা বলল—'ভাই শিকারি আমি আমার স্ত্রী এবং বাচ্চাদের থেকে অনেকক্ষণ আলাদা হয়ে আছি। ওরা খুব দুশ্চিন্তা করছে। ওদের সঙ্গে দেখা করে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তোমার কাছে ফিরে আসব। এই সময়টুকুর জন্য তুমি আমাকে যেতে দাও।'

শিকারি খুব বিরক্ত হল। ওর খুব ক্ষিদে পেয়েছিল। কিন্তু তবু সে হরিণটাকে যেতে দিল এই ভেবে যে—আমার ভাগ্যে যখন আজ অনাহারই আছে তখন অনাহারেই থাকব।

হরিণী নিজের বাচ্চাদের কাছে গেল। সে বাচ্চাদের দুধ খাওয়াল, আদর করল, পরে তার বান্ধবী এক হরিণীকে সব কথা বলে তাকে তার বাচ্চাগুলো সঁপে দিল। এই সময় ওখানে কালো হরিণটাও এসে গেল। সেও বাচ্চাগুলোকে আদর-সোহাগ করল, বাচ্চাগুলো তাদের মা-বাবাকে ছাড়তে চাইছিল না। শেষে তাদের আবদার মেনে নিয়ে হরিণ আর হরিণী বাচ্চাগুলোকেও সঙ্গে নিয়ে দিঘির দিকে চলল।

দিঘির কাছে এসে হরিণ শিকারিকে বলল—'ভাই শিকারি ! দেখ আমরা এসে গেছি, তুমি এখন তোমার তীর দিয়ে আমাদের মেরে, মাংস খেয়ে তোমার ক্ষিদে মেটাও।'

হরিণ আর হরিণীর সততা দেখে শিকারি খুব অবাক হয়ে গেল। সে গাছের উপর থেকে নীচে নেমে এসে বলল—'দেখো, এই হরিণীর কী সততা, এরা বনের পশু হলেও এদের কথার কত দাম ! এরা প্রাণের মায়া ত্যাগ করে সত্য রক্ষার জন্যে আমার কাছে ফিরে এসেছে। মানুষ হয়েও আমি কত নীচ আর পাপী যে নিজের পেট

ভরাবার জন্যে আর কয়েকটা পয়সার জন্যে কত নিরপরাধ পশুকে হত্যা করি। আজ থেকে আমি কোনো পশুকে বধ করব না। শিকারি নিজের ধনুকটা ভেঙে ফেলে দিল। সেই সময় আকাশ থেকে একটা সুন্দর সাজানো রথ নেমে এল। ওই রথে বসে থাকা দেবদূত বললেন—'শিকারি ! এই হরিণরা সত্যরক্ষা করে নিষ্পাপ হয়ে গেছে, এরা এখন স্বর্গে যাবে। তুমিও আজ এই নিরীহ জীবদের প্রতি দয়া দেখিয়েছ, তাই তুমিও এদের সঙ্গে স্বর্গে চল।'

হরিণ-হরিণী আর তাদের বাচ্চাদুটি দেবরূপ ধারণ করল। শিকারিও দেবরূপ লাভ করল। সত্য আর দয়ার প্রভাবে সকলে ওই সুন্দর সাজানো রথে চড়ে স্বর্গে চলে গেল।

—— • ——

৩৫ অপরকে ভরসা করতে নেই

একজন কৃষকের একটি গোরু আর একটি ঘোড়া ছিল। ওরা দুজনে একসঙ্গে জঙ্গলে চরতে যেত। ওই কৃষকের পাড়ায় এক ধোপা বাস করত। তার একটি ছাগল আর একটি গাধা ছিল। ধোপা ওই দুটিকেও ওই একই জঙ্গলে চরতে পাঠাত। একসঙ্গে চরার ফলে চারজনের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেল। ওরা একসঙ্গে জঙ্গলে যেত আবার সন্ধেবেলায় একসঙ্গে বাড়ি ফিরত। ওই জঙ্গলে থাকত একটা খরগোশ। খরগোশ ওই চার পশুর বন্ধুত্ব দেখে ভাবল—আমার সঙ্গে যদি এদের বন্ধুত্ব হয় তো বেশ হয়। এত বড় বড় জন্তুর সঙ্গে বন্ধুত্ব হলে কোনো কুকুর আর তাকে জব্দ করতে পারবে না।

খরগোশ ওই চার পশুর কাছে নিত্য যাতায়াত আরম্ভ করল। সে তাদের সামনে লাফাত-ঝাঁপাত আর ওদের সঙ্গে চরে বেড়াত। আস্তে আস্তে ওই চার পশুর সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব হয়ে গেল। এখন খরগোশ খুব খুশি। ও মনে করল কুকুরের ভয় এতদিনে দূর হল।

একদিন একটা কুকুর ওই জঙ্গলে ঢুকে খরগোশটাকে ধরবার জন্য ওর পিছনে ধাওয়া করতে লাগল। খরগোশ দৌড়তে দৌড়তে গোরুর কাছে গিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল—'গোমাতা ! গোমাতা ! ওই কুকুরটা বড় বদমাশ। ও আমাকে মারতে আসছে। তুমি ওকে তোমার

শিং দিয়ে মেরে ফেল।' গোরু বলল—'ভাই খরগোশ ! তুমি অনেক দেরিতে এলে। এখন আমার ঘরে ফেরার সময় হয়ে গেছে। মনে হয় আমার বাছুরটার খুব ক্ষিদে পেয়েছে তাই বারবার আমাকে ডাকছে। আমার ঘরে ফেরার তাড়া আছে। তুমি বরং ঘোড়ার কাছে যাও।'

খরগোশ দৌড়তে দৌড়তে ঘোড়ার কাছে গিয়ে বলল—'ঘোড়া ভাই! ঘোড়া ভাই! আমি তোমার বন্ধু। আমরা দুজনই এক সঙ্গে চরি। আজ ওই বদমাশ কুকুরটা আমার পিছু নিয়েছে। তুমি আমাকে পিঠে বসিয়ে দূরে কোথাও নিয়ে চল।'

ঘোড়া বলল—'তোমার কথা তো ঠিক, কিন্তু আমি তো বসতে পারব না। আমি তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ঘুমাই। তুমি আমার পিঠে চাপবে কী করে ? আজকাল আমার দুর্বলতাও বেড়ে গেছে। আমি না পারি জোরে দৌড়তে, না পারি পা ভাঁজ করতে।'

ঘোড়ার কাছে থেকে নিরাশ হয়ে খরগোশ গাধার কাছে গিয়ে গাধাকে বলল—'গাধা ভাই ! গাধা ভাই ! তুমি ওই পাজি কুকুরটাকে এক লাথি ঝেড়ে দাও তো তাহলে আমার প্রাণটা বাঁচে !' গাধা বলল—'আমি প্রতিদিন গোরু আর ঘোড়ার সঙ্গে ঘরে ফিরি। ওরা দুজন চলে যাচ্ছে। যদি আমি ওদের সঙ্গে না গিয়ে পিছনে পড়ে থাকি তবে আমার মনিব ধোপা লাঠি নিয়ে দৌড়ে আসবে আর পিটতে পিটতে আমার নাড়িভুঁড়ি বার করে দেবে। অতএব এখন আমার অপেক্ষা করা অসম্ভব।'

শেষে খরগোশ ছাগলের কাছে গেল। ছাগল ওকে দেখেই বলল—'খরগোশ ভাই ! দয়া করে এদিকে এস না। তোমার পিছনে একটা কুকুর দৌড়চ্ছে, আমি ওকে খুব ভয় করি।'

সব জায়গায় নিরাশ হয়ে খরগোশ সেখান থেকে পালাল। পালাতে
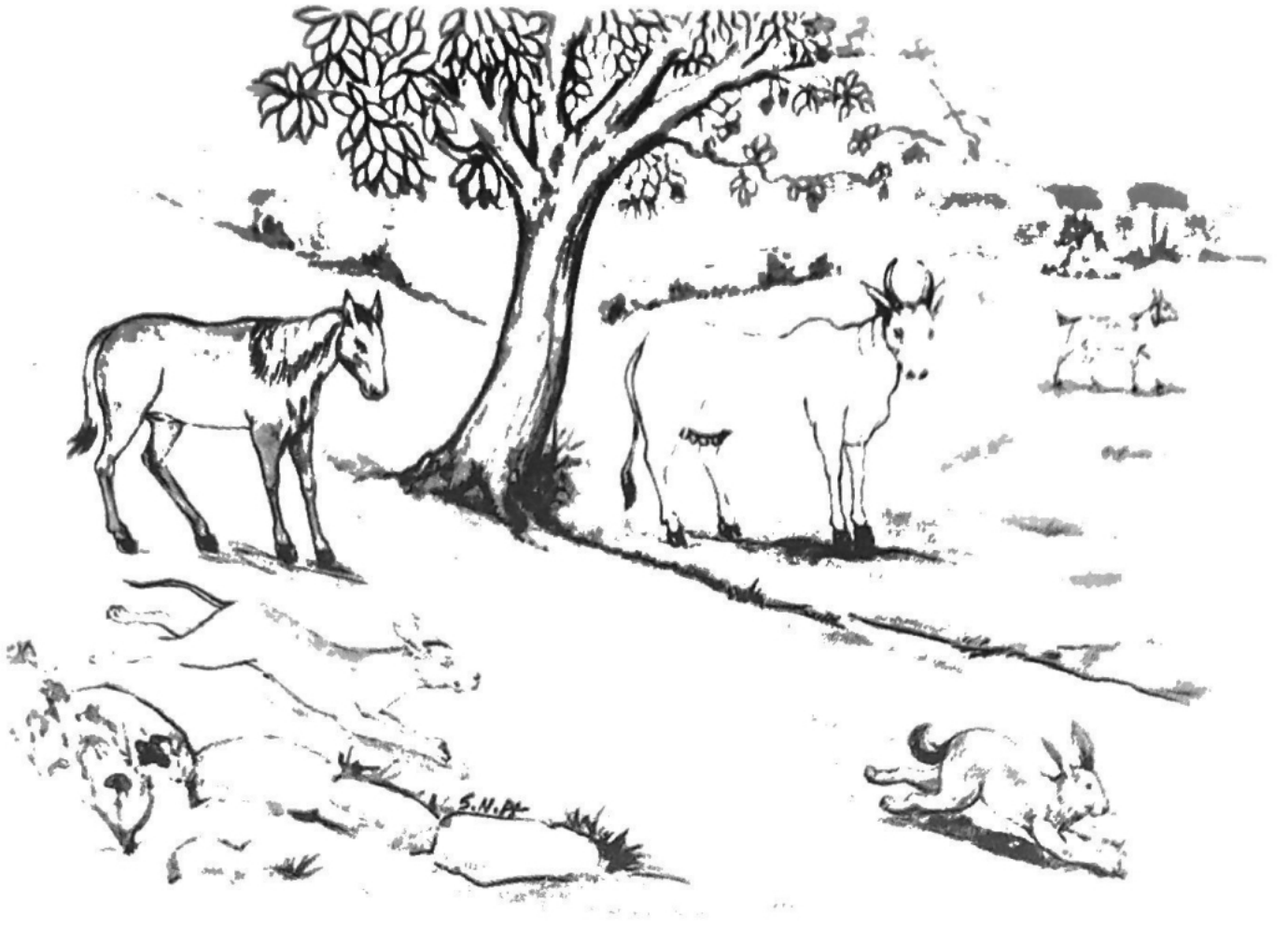
পালাতে সে গিয়ে একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। কুকুরটা অনেক খুঁজেও তার পাত্তা পেল না। যখন কুকুরটা ফিরে গেল তখন খরগোশ ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল। সে চারিদিকটা একবার দেখে নিয়ে আরামে নিশ্বাস ফেলল। আর মনে মনে বলল—'অপরের ভরসায় সর্বদা ধোঁকা খেতে হয়। নিজের সহায় নিজেকেই হতে হয়।'

মিথ্যা বড়াই-এরপরিণাম

সমুদ্রের তীরে কোনো এক নগরে এক ধনবান ব্যক্তি বাস করত। তার ছেলে একটা কাক পুষেছিল। প্রতিদিন সে নিজের পাতের খাবার কাকটাকে খেতে দিত। তার পাতের সুস্বাদু আর পুষ্টিকর এঁটো খাবার খেয়ে কাকটা বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠেছিল। কাকের এজন্য খুব গর্ব। সে তার থেকে শ্রেষ্ঠ পাখিদেরকেও তুচ্ছ জ্ঞান করতে আর অপমান করতে আরম্ভ করল।

একদিন সমুদ্রের ধারে অন্য জায়গা থেকে কতকগুলো হাঁস উড়ে এসে নেমেছিল। সেই ধনী ব্যক্তির ছেলেটির ওই হাঁসগুলোর খুব তারিফ করা শুনে কাকটার আর সহ্য হল না। সে ওই হাঁসগুলোর কাছে গিয়ে যে হাঁসটা সবচেয়ে সুন্দর তাকে বলল—'আমি তোমাদের সঙ্গে বাজি রেখে উড়তে চাই।'

হাঁসেরা তাকে বোঝাবার চেষ্টা করল—'ভাই, আমরা তো দূরদূরান্তে উড়ে বেড়াই। এখান থেকে বহু দূর মানস সরোবরে আমরা থাকি। আমাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে তোমার কী লাভ ? তুমি হাঁসদের সঙ্গে কী করে উড়তে পারবে ?'

কাক গর্ব করে বলে উঠল—'আমি একশো রকম ওড়বার কায়দা জানি আর এক এক কায়দায় একশো যোজন পর্যন্ত পাড়ি দিতে পারি।' উড্ডীন, অবডীন, প্রডীন, ডীন ইত্যাদি বহুরকম কায়দাওয়ালা গতির

কথা বাক্যবাগীশ কাক ওদের গুনে গুনে শুনিয়ে বলল—'বল তোমরা এসব গতির কোনটায় উড়তে চাও ?'

তখন ওদের মধ্যে প্রধান হাঁসটি বলল—'কাক ! তুমি তো খুব কুশলী বটে। কিন্তু আমি তো একটিমাত্র কায়দা জানি যা সব পাখিরাই জানে। আমি ওই কায়দায়ই উড়ব।'

অহংকারী কাকের গর্ব আরও বেড়ে গেল। সে বলল—'ঠিক
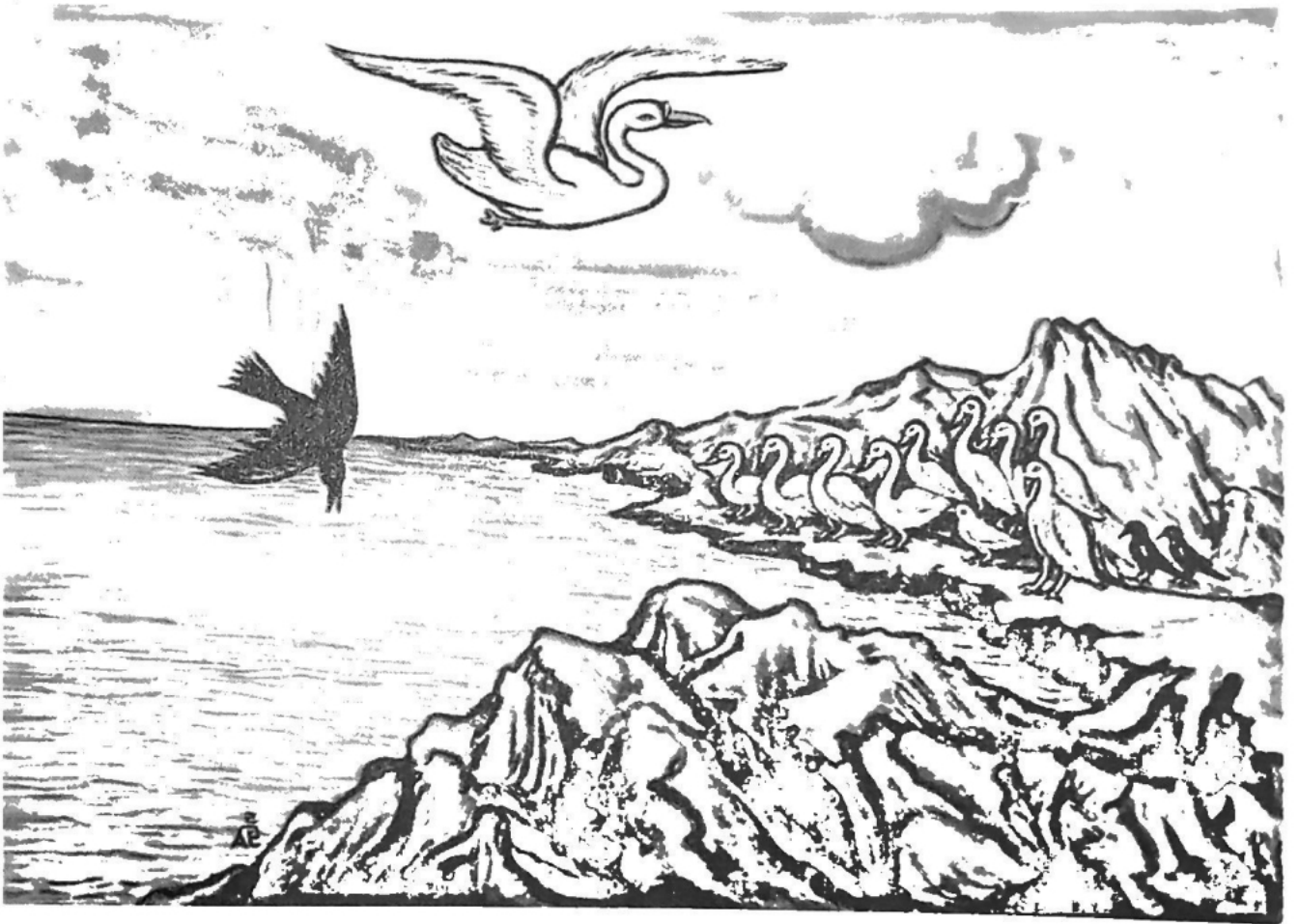
আছে, তুমি যে গতি জান তাতেই ওড়ো।'

সেই সময় আরও কিছু কাক এবং অন্যান্য পাখি সেখানে এসে হাজির হল। তাদের সামনেই কাক আর হাঁস দুজনে সমুদ্রের দিকে উড়ে চলল। সমুদ্রের ওপরে শূন্যে কাকটা নানা রকম কৌশল দেখাতে দেখাতে পুরোদমে উড়তে থাকল এবং হাঁসটার থেকে অনেক এগিয়ে গেল। হাঁস তার স্বাভাবিক ধীর গতিতে উড়ে যাচ্ছিল। এই দেখে পাড়ে

দাঁড়িয়ে থাকা অন্য কাকগুলো খুশিতে খুব ডগমগ করতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরেই কাকের পাখা ধরে এল। সে এধার-ওধার চাইতে লাগল, কোথাও গাছপালাওয়ালা দ্বীপ দেখা যায় কিনা। কিন্তু ওই অসীম সমুদ্রে জল ছাড়া আর কিছুই সে দেখতে পেল না। ইত্যবসরে উড়তে উড়তে হাঁসটি তাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেল। কাকের গতি কমে গিয়েছিল। সে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল ফলে উঁচু উঁচু ঢেউওয়ালা আর ভয়ংকর প্রাণীতে ভরা সমুদ্রের তরঙ্গের ওপরে আছড়ে পড়ার মতো তার অবস্থা হয়ে গেল।

হাঁস কাককে অনেক পিছনে পড়ে থাকতে দেখে থেমে গেল। সে কাকের কাছে ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করল—'কাক ! তোমার ঠোঁট আর পাখনা বারবার জলে ডুবে যাচ্ছে। এ তোমার কোন গতি ?'

হাঁসের ব্যঙ্গভরা কথা শুনে কাক খুব করুণভাবে বলল—'হাঁস, আমরা কাকেরা শুধু কা-কা করতেই জানি। আমাদের কি এত দূরে ওড়া চলে ? আমার বোকামির শাস্তি আমি পেয়ে গেছি। তুমি ভাই, দয়া করে এখন আমার প্রাণ বাঁচাও।'

জলে ভেজা, অচেতনপ্রায় আর আধমরা কাকটার ওপর হাঁসের দয়া হল। সে তাকে তার পায়ে করে তুলে নিজের পিঠের ওপরে চাপিয়ে নিল। তারপর বয়ে নিয়ে যেখান থেকে ওরা উড়েছিল সেখানে এসে নামল। হাঁস কাককে সেখানে পিঠ থেকে নামিয়ে দিয়ে যেখান থেকে তারা এসেছিল সেখানে উড়ে চলে গেল।

—— • ——